বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী

তারিখ নির্দ্দেশক পত্র

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে।

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
767	26/5	31/5			
[illegible]	[illegible]	7/12			
667	10/7	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
753	[illegible]	[illegible]			
455	18/5	21/5			
663	4/11/77				
851	[illegible]				
786	15/11	21/11			
[illegible]	[illegible]	28/3			
1191	[illegible]				

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদা তা	ণের রিখ

কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্য[redacted]

এম এ কর্ত্তৃক প্রণীত।

সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ॥

কলিকাতা, অখিল মিস্ত্রীর গলি, ৭০ নং বাটী
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
কার্ত্তিক ১৩২৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য

কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যা[redacted]

এম এ কর্ত্তৃক প্রণীত ।

সংসার-বিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে ।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ ॥

কলিকাতা, অখিল মিস্ত্রীর গলি, ৭০ নং বাটী
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।
কার্ত্তিক ১৩২৫

দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য

বিষয়-সূচি।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

উৎসর্গ।

যেমন

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করে,

তেমনই

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব-পরিচায়ক এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা

বঙ্কিমচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতির

তর্পণ করিলাম।

দুর্ব্বল মোরা, কত ভুল করি, অপূর্ণ সব কাজ !
নেহারি' আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনি যে পাই লাজ !
তা বলে' যা' পারি তাও করিব না ? নিষ্ফল হব ভবে ?
প্রেম ফুল ফোটে, ছোট হ'ল বলে', দিব না কি তাহা সবে ?
হয় ত এ ফুল সুন্দর নয় ধরেছি সবার আগে,
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে, ভুলে কারো ভাল লাগে।
যদি ভুল হয়, ক'দিনের ভুল ! দু'দিনে ভাঙিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন সেই কি অমর হবে ?

রবীন্দ্রনাথ—'মানসী'।

কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র চৌদ্দ-খানি আখ্যায়িকা লিখিয়া গিয়াছেন ('মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' ঠিক এই শ্রেণীর নহে)—তন্মধ্যে তিনখানি প্রথম-প্রকাশ-কালে নিতান্ত ক্ষুদ্রকায়া ছিল। সে তিনখানির মধ্যে 'রাধারাণী' কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে ; 'ইন্দিরা' বিলক্ষণ বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে। বাকী এগার-খানির মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' ক্ষুদ্রতম। ইহা এত ক্ষুদ্র যে নূতন 'ইন্দিরা'ও ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর হইয়াছে। অথচ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সৌন্দর্য্যের খনি। ইংরেজ কবি যথার্থই বলিয়াছেন :—

In small proportions we just beauties see
And in short measures life may perfect be.

'বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে'র ন্যায় সমসাময়িক প্রকাণ্ড-কলেবর আখ্যায়িকার সহিত ক্ষুদ্রকায়া 'কপালকুণ্ডলা'র তুলনা করিলে উদ্ধৃত উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করা যায় ; বঙ্কিমচন্দ্র যদি কেবল এই একখানি পুস্তক লিখিয়া যাইতেন, তাহাতেই তিনি অমর হইতেন, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ, কালিদাসের যেমন মেঘদূত, জয়দেবের যেমন গীতগোবিন্দ, গ্রের যেমন এলিজি, ক্ষুদ্র হইলেও তত্তৎ কবির কীর্ত্তির এক একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন, কপালকুণ্ডলাও সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্ত্তির একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

'কপালকুণ্ডলা'র চিত্রপট (canvas) অল্প-পরিসর, বৃত্তান্ত ক্ষুদ্র, বিশেষতঃ নায়িকার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধযুক্ত বৃত্তান্ত নিতান্ত ক্ষুদ্র, পাত্রপাত্রীর সংখ্যা অল্প, ঘটনার বাহুল্য বা জটিলতা নাই, কিন্তু গ্রন্থের কবিত্ব, কলাকৌশল, কল্পনা অপূর্ব্ব। ইহাতে দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতির নারীর দুইটি স্বতন্ত্র আখ্যান বর্ণিত, অথচ আখ্যানদ্বয় সুকৌশলে একত্রগ্রথিত, কোথাও কোনরূপ অসঙ্গতি নাই। সমগ্র বস্তু সুসংহত, সুসজ্জিত, সুন্দর, শোভন। গ্রন্থে বিদ্যাদিগ্‌গজ-ঘটিত বা গিরিজায়া-দিগ্‌বিজয়-ঘটিত মোটা রসিকতা কুত্রাপি নাই, সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। উৎকট রুচিবাগীশেরা হয় ত 'কুসুমে কুসুমে বিহারিণী' পদ্মাবতীর বিলাস-লালসা-পরিতৃপ্তির বিবরণ ও শ্যামার দু'চারিটি রসিকতা-সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের জন্য 'শিশুশিক্ষা' 'বোধোদয়' 'নীতিবোধ' প্রভৃতি ভিন্ন পুস্তকনির্ব্বাচন নিরাপদ্ নহে।

স্থূল কথা, যাঁহারা কাব্যে নীতিশিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা ও চরিত্রের আদর্শ-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উদ্দেশ্যের অপেক্ষা না করিয়া, কাব্যসৌন্দর্য্য, কলাকুশলতা, কল্পনার বিচিত্রলীলা প্রভৃতির তজ্জ্ঞ, Art for Art's sake সূত্রের অনুরাগী, তাঁহাদিগের নিকট 'কপালকুণ্ডলা' উপাদেয়, অনবদ্য, 'কিমপি দ্রব্যম্'—A thing of beauty is a joy for ever.

এই আখ্যায়িকার নায়ক নবকুমারের চরিত্রে সাহস, পরোপকারিতা, ভাবুকতা, প্রগাঢ় প্রণয়, সংযম, ইত্যাদি সদ্‌গুণ মনোহারী ও তাঁহার শেষাবস্থার চিত্তবিক্ষোভ মর্ম্মভেদী; ইন্দ্রিয়সুখনিরতা প্রতিনায়িকা পদ্মাবতীর পতিপ্রেমের প্রভাবে চরিত্রের পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন হৃদয়স্পর্শী; স্নেহময়ী শ্যামার সখিত্ব মধুর, তাঁহার স্বামিসৌভাগ্য-কামনা করুণ; প্রেম-ময়ী ভুবনসুন্দরী মিহরুন্নিসার হৃদয়রহস্য বিস্ময়াবহ; করুণাময় অধিকারী ও ক্রূরকর্ম্মা কাপালিকের দেবীভক্তির প্রকারভেদ প্রণিধানযোগ্য। এই

সকল বিচিত্র প্রকৃতির পাত্রপাত্রী-সমাবেশে চিত্রপট সমুজ্জ্বল ; ইহাদিগের (contrast) বিরোধিতায় কাব্যের কেন্দ্রস্থানীয়া নায়িকার চরিত্র অধিক-তর পরিস্ফুট ; বিশেষতঃ বিষয়-সুখ-ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা পদ্মাবতী ও সংসারসুখে নিঃস্পৃহা 'সন্ন্যাসিনী' কপালকুণ্ডলার চরিত্র-বৈপরীত্যে কাব্যরস ঘনীভূত। এ সমস্তই গ্রন্থের উৎকৃষ্টতার উপাদান ; কিন্তু এই রত্নহারের মধ্যমণি নায়িকা কপালকুণ্ডলা। তাঁহার জীবনের ইতিহাস বিস্ময়কর, কৌতূহলাবহ এবং মনোহারী, তাঁহার শেষ পরিণাম হৃদয়-বিদারক, তাঁহার চরিত্র কবির অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, অদ্বিতীয় (unique) সৃষ্টি।

আর এই চরিত্রসৃষ্টিব্যপদেশে কবি মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের একটি কঠিন প্রশ্ন, দার্শনিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত বিচার করিয়াছেন, অথচ এই বিচারে কিঞ্চিন্মাত্র নীরসতা, কর্কশতা, জটিলতা বা অস্পষ্টতা নাই। তিনি দার্শনিক প্রশ্ন কল্পনার বিচিত্রতূলিকাস্পর্শে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন, দার্শনিক তত্ত্ব হৃদয়দ্রাবী কাব্যরসে অভিষিক্ত করিয়া ভাবুক-সমাজে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই মানসী মূর্ত্তির পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র জগতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে পূর্ব্বগামী কবিগণের কাব্য হইতে কোন কোন ভাব ও উপাদান গ্রহণ করিলেও তাঁহার মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

দার্শনিক তত্ত্ব।

গ্রন্থে বিচারিত দার্শনিক প্রশ্নটি এই :—মনুষ্যসমাজ হইতে দূরে, মানবসভ্যতার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ-ব্যতিরেকে, যদি নারীপ্রকৃতির বিকাশ হয়, তাহা হইলে সেই নারীপ্রকৃতিতে কি কি উপাদান পরিদৃষ্ট হইবে ? অর্থাৎ কেবল প্রকৃতির শিক্ষায় ও সহজাত সংস্কারের প্রভাবে, মানবসমাজের

সংস্পর্শজনিত কোন প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে, নারীপ্রকৃতি কি ভাবে গড়িয়া উঠিবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাইলে আমরা আর একটি প্রশ্নেরও উত্তর সঙ্গে সঙ্গে পাইব:—নারীপ্রকৃতির মূল উপাদান—essential elements of womanhood—কি? কেন না প্রকৃতি-পালিতা নারীর চরিত্রে যে যে গুণ ও যে যে দোষ থাকিবে, তাহাই নারীর 'মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ'। এই প্রশ্নের সঙ্গে গ্রন্থকার আর একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্নের (rider) বিচার করিয়াছেন:—শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত এই প্রকারে গঠিতচরিত্রা কুমারীকে যদি বিরলমনুষ্য অরণ্যপ্রদেশ হইতে লোকালয়ে গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবাহিত অবস্থায় স্থানান্তরিত (transplant) করা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হয় কি না; এবং হইলে কি প্রকার পরিবর্ত্তন হয়? 'কপালকুণ্ডলা' এই দার্শনিক প্রশ্নের কাব্যাত্মিকা আলোচনা। গ্রন্থকার উল্লিখিত প্রশ্নের বিচারকালে, নায়িকার শিক্ষা ও সংসর্গবশে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিকাশে একটি বিশিষ্ট প্রকারের ঝোঁক (bias) নায়িকা-চরিত্রের অন্তর্নিহিত করিয়া, সেই চরিত্রে একটি অসাধারণত্ব আনিয়া দিয়াছেন।

মূল প্রশ্নটি কঠিন। পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও পরীক্ষা (experiment) দ্বারা ইহার সমাধান সম্ভবপর নহে। মানবসমাজে বসিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুর এরূপ পর্য্যবেক্ষণাদি চলে না, কেন না মানবসমাজ হইতে সুদূরে সংস্থাপিত না হইলে এবংবিধ নারীপ্রকৃতি বিকশিত হইতে পারে না। পর্য্যবেক্ষণ-উদ্দেশ্যে জনশূন্য অরণ্য বা মরুপ্রান্তরে যাত্রা ও অবস্থিতি করাও সুসাধ্য ব্যাপার নহে। আর এক কথা। যেমন বৈজ্ঞানিক বলেন, একটি স্থানকে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা (absolute vacuum) অসম্ভব, সেইরূপ মনুষ্যসমাজের সর্ব্বাংশে সংস্পর্শহীন নারীর সন্ধান পাওয়াও অসম্ভব। কন্যা যখন আকাশসম্ভবা বা ভূগর্ভোত্থিতা

হইতে পারে না, * তখন অন্ততঃ পক্ষে সদ্যঃপ্রসূতা কন্যা জনহীন প্রদেশে পরিত্যক্তা হইবে এবং অলৌকিক উপায়ে তাহার প্রাণরক্ষা হইবে, এইরূপ ঘটনা না হইলে উক্তবিধ পর্য্যবেক্ষণের অবকাশ হয় না। শৈশবে জনকজননী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া মনুষ্য-সাহায্য-ব্যতীত বর্দ্ধিতা হইলেও সেই কন্যা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিদত্ত দোষগুণের আধার হইবে কি তাহার চরিত্রে মাতাপিতার দোষগুণ, বংশের দোষ গুণ ও জাতীয় বিশিষ্টতা (racial characteristics) সংক্রমিত হইবে, ইহাও বিতর্কের বিষয়। সম্ভবতঃ এরূপ কন্যা বাঁচিয়া থাকিলে, পশুবৎ মূকবৎ বা নির্ব্বোধবৎ (idiot) আচরণ করিবে। এরূপ চরিত্র দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইলেও

---

* দার্শনিক-সমাজে এরূপ আজগবী কল্পনাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা:— 'In the beginning of the 11th century this system of self-improvement had been exemplified in a tract by the celebrated Avicenna. ...It is feigned that a human being was produced in a delightful but uninhabited island, without the intervention of mortal parents, by mere concourse of the elements—a notion not unlike the systems of Democritus and Epicurus, as explained by Lucretius. The being, hatched in this unusual manner, though destitute of instruction, obtained by exertion what was most essential to personal convenience, and finally arrived by meditation at the abstract truths of religion.' *Dunlop's History of Fiction* ch 13. ডন্‌লপ্ আরও বলেন যে দ্বাদশ শতাব্দীতে Ebn-Tophail নামক একজন মহম্মদীয় দার্শনিকের লিখিত একটি কেচ্ছা (Hai Ebn Yokdhan) এই ভাবে অনুপ্রাণিত। তবে তাহাতে মানবীগর্ভসম্ভূত সদ্যঃপ্রসূত সন্তান জনশূন্য দ্বীপে পরিত্যক্ত হইয়াছে ও হরিণীর স্তন্যপান করিয়া শিশু ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছে। উভয়ত্রই শিশুটি বালক, বালিকা নহে।

কাব্যের উপজীব্য হইতে পারে না। সুতরাং প্রশ্নটি যে ভাবে উপস্থাপিত করিলাম, ঠিক সে ভাবে কোন কবিই কাব্যের বিষয়ীভূত করেন নাই, করিবার জন্য কৌতূহলবোধও করেন নাই।

মিল্‌টন ঈভের চিত্র অঙ্কিত করিবার সময় আদিম-নারীপ্রকৃতির উপাদান বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বটে (কেন না য়িহুদি ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের মতে ঈভ বিধাতার সৃষ্ট প্রথম নারী, তিনি মানবী-গর্ভসম্ভূতা নহেন।) কিন্তু ঈভও নিতান্ত একাকিনী নহেন, আদম তাঁহার আজন্ম সঙ্গী ও শিক্ষাদাতা। আর মিল্‌টনের কল্পনায় নিষ্পাপ অবস্থায় মানবমানবী বহুদর্শনের অভাবেও পূর্ণ মানুষোচিত জ্ঞান ও গুণে ভূষিত। ইহা মানবপ্রকৃতিসম্মত কি কবিকল্পনাসম্ভূত, তাহা অবশ্য তর্কের বিষয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের 'প্রকৃতিপ্রদত্ত শিক্ষা' ('Education of Nature') কবিতায় প্রকৃতির প্রভাবে নারীর চরিত্রগঠনের একটি সুন্দর কাল্পনিক বিবরণ আছে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কন্যাটি আকাশসম্ভবা নহে, মনুষ্য-সমাজেই তাহার জন্ম, এবং বাস্তব হিসাবে দেখিতে গেলে জীবনের প্রথম তিন বৎসরের মধ্যেই হউক অথবা পরেই হউক, কন্যাটি যে একেবারে সমাজের ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, অন্ততঃ সমাজের প্রভাব একেবারে এড়াইতে পারিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস্য নহে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, একেবারে মনুষ্যসংসর্গরহিত নারীপ্রকৃতির কল্পনা কাব্য-রসহীন জল্পনামাত্র। সুতরাং কাব্যের ভিতর দিয়া এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে হইলে, সমাজের ও সভ্যতার সাক্ষাৎ প্রভাব যথাসম্ভব অল্প হইবে, এবং প্রকৃতির প্রভাব যথাসম্ভব অধিক হইবে, এইরূপ নারীপ্রকৃতির কল্পনা করিয়া কাব্যরচনায় ব্রতী হইতে হইবে।

ফরাসীবিপ্লবের প্রাক্কালে রূসো শ্যাটোব্রিয়ং প্রভৃতি বিখ্যাত ফরাসী লেখকগণ, সভ্যতার প্রভাবে মানবচরিত্র কলুষিত বিকৃত হয় এবং অসভ্য

অবস্থায় মানবপ্রকৃতি বিশুদ্ধ অবিকৃত থাকে এই মতবাদ প্রচার করেন এবং সভ্যতার সংস্পর্শশূন্য আদিম বর্ব্বর প্রকৃতির উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রশংসা করেন—তাঁহাদিগের মতে (noble savage) মহনীয়-চরিত্র বর্ব্বর আদর্শমানব। সভ্য জগৎ হইতে বহুদূরে লালিত-পালিত নরনারী-চরিত্রের সরলতা, কোমলতা, পবিত্রতা, উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বর্ণনা করিয়া ফরাসী লেখক সেণ্ট পিয়ের (St. Pierre) Paul & Virginia ও The Indian Cottage নামক দুইটি উপাখ্যান রচনা করেন। এই চিত্রগুলি রমণীয়। পক্ষান্তরে ইহার এক শতাব্দী পূর্ব্বে ইংরেজ কবি ড্রাইডেন শেক্‌স্‌পীয়ারের উপরে খোদকারি করিয়া মিরাণ্ডার ভগিনী ডোরিণ্ডার সৃষ্টি করেন, সেই উদ্ভট স্ত্রী-ঋষ্যশৃঙ্গ নিতান্ত অশোভন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পূর্ব্বোল্লিখিত কবিতাও এই মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

নারীপ্রকৃতির উপাদান।

এক্ষণে উল্লিখিত দার্শনিক প্রশ্নটি আর একদিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রকৃতি-পালিতা নারীকে কাব্যের কেন্দ্রস্থানীয়া করিতে হইলে তাঁহার প্রকৃতিতে আমরা কি কি উপাদান কল্পনা করিতে পারি? অবশ্য আদিম মানবপ্রকৃতিতে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে দুর্দ্দম কৌতূহলপরায়ণতা, বিস্ময়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাহস, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি স্বভাবজ বৃত্তি থাকিবে। কিন্তু এই সকল বৃত্তিতে রমণীর রমণীয়ত্ব সম্পাদিত হয় না। রমণীয় রমণীতে আমরা দেহের সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের কোমলতা এবং কায়িক বাচিক ও মানসিক পবিত্রতা আশা করি। লজ্জা ও সরলতা উভয় গুণই নারীপ্রকৃতির ভূষণ; বঙ্কিমচন্দ্র লজ্জাকে 'স্ত্রী-স্বভাবসুলভ' বলিয়াছেন *; কিন্তু এ দুইটি এক হিসাবে পরস্পরের

* আনন্দমঠ (২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, শান্তিচরিত্রের বিকাশ)।

বিপরীত ধর্ম্ম, কেন না লজ্জা অনেক পরিমাণে সমাজের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের, আচারনিয়মের ফল। অতএব প্রকৃতি-পালিতা রমণীতে সরলতা বরণীয়, কিন্তু লজ্জা অপেক্ষা লজ্জার অভাবই অধিকতর স্বাভাবিক। অথচ ইহা লজ্জাহীনতা বা বেহায়ামি হইলেও অশোভন হইবে। আমরা কপালকুণ্ডলার চরিত্র-বিশ্লেষণকালে দেখিব যে, তাঁহার চরিত্রে পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি বিদ্যমান। বিশেষতঃ, তাঁহার সৌন্দর্য্য অনুপম, স্নেহ-করুণা অপরিসীম, সরলতা অকৃত্রিম, পবিত্রতা অনবদ্য। কবির বর্ণনাকৌশলে তাঁহার লজ্জার অভাব চরিত্রের মাধুর্য্য নষ্ট করে নাই, প্রত্যুত, ইহা অকৃত্রিম সরলতার নিদর্শন বলিয়া সাতিশয় হৃদ্য হইয়াছে। কেন না 'লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা' † তাহা তাঁহার চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে।

এ সকল ছাড়া আর একটি গুণ মনোহারিণী নারীপ্রকৃতির মজ্জাগত। ইহা গভীর ধর্ম্মভাব। এই বৃত্তি কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। এতৎসম্বন্ধে কি বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়, তাহা কপালকুণ্ডলার চরিত্রবিশ্লেষণ-কালে আলোচিত হইবে।

কিন্তু এই সকল গুণের সমাবেশেই কি নারীপ্রকৃতি মনোহারিণী হইবে? সকলেই একবাক্যে বলিবেন:—নারীপ্রকৃতির মনোহারিত্বের শ্রেষ্ঠ ও প্রেষ্ঠ উপাদান—প্রণয়শীলতা। প্রণয়হীন নারীহৃদয় মধুহীন কুসুমের ন্যায়—নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ—অনাদরণীয়। সাধারণতঃ কবি-দিগের মধ্যেও চিরাগত সংস্কার:—প্রণয়ের আদান-প্রদানই নারীর প্রকৃতিসিদ্ধ বৃত্তি, ইহাই নারীজীবনের সার্থকতা—To love and to be loved is her glorious destiny—নারীর চরম ও পরম গৌরব। বিজ্ঞ সামাজিকগণ বলিবেন:—পতিপ্রীতি, পতিভক্তি, সন্তানস্নেহ,—

† বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা ও মিরান্দা' প্রবন্ধ।

রমণীর রমণীয়তার প্রধান উপাদান, নারীমহিমার প্রকৃত নিদান। কাব্যের ভাষায় বলিতে গেলে, দাম্পত্যপ্রণয় ললিতা বনিতা-লতার ফুল্ল কুসুম, আর সন্তান তাহার মধুময় ফল। জগতের প্রসিদ্ধ কবিগণ সকলেই এই রায়ে রায় দিয়াছেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বর্ত্তমানক্ষেত্রে বুঝাইতে চাহেন :—এই Sex-attraction, এই আসঙ্গলিপ্সা, এই যৌনসম্বন্ধ, এই হৃদয়মিলন, এই প্রণয়, এই দাম্পত্যপ্রেম, হয় ত সম্পূর্ণ নৈসর্গিক প্রবৃত্তিজাত নহে ; শারীরবৃত্তিই বল আর হৃদয়-বৃত্তিই বল, এই আকর্ষণ, এই আকাঙ্ক্ষা, হয় ত নারী-প্রকৃতির মৌলিক অঙ্গ নহে ; * ইহা কতকটা কৃত্রিম, সমাজ ও সভ্যতার সংস্পর্শে সঞ্জাত, মানবজাতির হৃদয়বৃত্তির ক্রমিক অনুশীলনে উদ্ভূত। যেখানে সমাজের, সভ্যতার, প্রভাব নাই, এবং সেই প্রভাবে নারীপ্রকৃতি প্রভাবিত হয় নাই, সেখানে ইহা না-ও জন্মিতে পারে। এই প্রণয়-প্রবৃত্তির অভাব কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার কারণস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন—কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি বাল্যাবধি অধিকারী ও কাপালিকের প্রদত্ত শিক্ষায় এবং তাঁহাদিগের সংসর্গে এমন ভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, করুণা ও ধর্ম্মপ্রবণতা ছাড়া আর অন্য কোন বৃত্তির তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই অদ্ভুত চরিত্রের সম্ভাব্যতা স্থাপন করিবার জন্য তিনি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির একটি বিশিষ্ট প্রকারের ঝোঁক (bias) এই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত করিয়াছেন। অবশ্য, ইহাই যে উপস্থাপিত দার্শনিক প্রশ্নের অভ্রান্ত চূড়ান্ত মীমাংসা, কবি তাহা বলিতে চাহেন না। বিচারশক্তি ও কল্পনার সমবায়ে তিনি

---

* রুসো কিন্তু বলেন, ইহা আদিম-মানব-প্রকৃতিতে থাকে, তবে ইহা তখন শারীর ও ক্ষণিক।

এই তত্ত্ব theorem হিসাবে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হন নাই, theory হিসাবে খাড়া করিয়াছেন এবং এই theoryর ভিত্তির উপর তাঁহার literary experiment গড়িয়া তুলিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রণয়হীন নারীহৃদয় অনাদরণীয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ কলাকৌশলে তাঁহার গ্রন্থের নায়িকার চিত্র এমনভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, প্রণয়ের অভাবেও উক্ত চরিত্রে কর্কশতা, নীরসতা, কুৎসিতত্ব, নিন্দনীয়ত্ব, কিছুমাত্র উপলব্ধ হয় না। যেন এই এক অভাব 'একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।' এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব।

অন্যান্য কবির সৃষ্টি।

'কপালকুণ্ডলা'-পাঠকালে নায়িকার নৈসর্গিক সরলতা, কোমলতা, প্রভৃতি গুণের সহিত পরিচয়ে তাহার ন্যূনাধিক-পরিমাণে সমশ্রেণীর কয়েকটি চরিত্রের কথা মনে পড়ে। যথা, গ্রীক্ কবি হোমারের (ওডিসিতে বর্ণিত) রাজকুমারী নসিকেয়া, কালিদাসের শকুন্তলা, শেক্স্পীয়ারের মিরাণ্ডা, মিল্টনের ঈভ, এবং বায়রনের (ডন জুয়ানে বর্ণিত) হেইডী।* সকলগুলিই বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী, † সকলগুলিই (সম্ভবতঃ)

* বঙ্কিমচন্দ্র ডন জুয়ানের ২য় সর্গ হইতে কপালকুণ্ডলার ১ম খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদের শীর্ষে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সর্গেই হেইডীর বৃত্তান্ত আরব্ধ। অতএব এই বৃত্তান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের অবিদিত ছিল না, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

† বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকালের পরে প্রকাশিত মেরী করেলির থেল্‌মা আখ্যায়িকার নায়িকাও কতকটা এই শ্রেণীভুক্তা। শেক্স্পীয়ারের ঈষৎ পরবর্ত্তী স্পেন দেশের নাটকে এইরূপ প্রকৃতিদুহিতার চিত্র আছে। শেক্স্পীয়ারের মিরাণ্ডার অনুকরণে ইংরেজী নাটকে এই শ্রেণীর কয়েকটি চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ফরাসী-সাহিত্যে সেণ্ট পিয়েরের ভার্জ্জিনিয়া এই শ্রেণীর। ইহা ছাড়া নাগরিক

তাঁহার পরিচিত, সকলগুলির স্রষ্টাই উচ্চশ্রেণীর কবি। এক্ষণে এই সকল চরিত্রের সহিত কপালকুণ্ডলার সাদৃশ্য সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়া পরে বিস্তারিত-ভাবে তুলনায় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

অন্যান্য কবির সৃষ্টির সহিত সাদৃশ্য।

দার্শনিক তত্ত্বের প্রসঙ্গে বলিয়াছি, উল্লিখিত শ্রেণীর নারীচরিত্র বর্ণনা করিতে হইলে,—প্রকৃতির প্রভাব যথাসম্ভব অধিক হইবে, সমাজ ও সভ্যতার সাক্ষাৎ প্রভাব যথাসম্ভব অল্প হইবে, এই প্রণালী অবলম্বনীয়। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সকল কবিই এই প্রণালী অল্পবিস্তর পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন। এক নসিকেয়া ছাড়া সকলেই উন্মুক্ত প্রকৃতির পরিবেষ্টনীর মধ্যে লালিতা পালিতা। ঈভ জিহোভার সৃষ্ট নন্দনোদ্যান-বিহারিণী, শকুন্তলা মালিনীতীরতপোবন-চারিণী, মিরাণ্ডা ও হেইডী সমুদ্রমধ্যগত-দ্বীপবাসিনী, কপালকুণ্ডলা অরণ্যবিহারিণী ও সমুদ্রকূলচারিণী। নসিকেয়া রাজার নন্দিনী ও রাজভবনবাসিনী হইলেও নায়কের সাক্ষাৎকালে সমুদ্রতীরবর্ত্তিনী।

হোমারের নসিকেয়া রাজার নন্দিনী, রাজার ভবনে প্রতিপালিতা, তাঁহার সহিত কপালকুণ্ডলার তুলনার প্রস্তাবে হয় ত অনেকে আপত্তি করিবেন। কিন্তু হোমার যে কাল ও যে দেশের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সে কালে ও সে দেশে রাজকন্যারা নেতা ধোপানী ও রামী রজকিনীর

সভ্যতা হইতে দূরসংস্থিতা পল্লীপালিতা যুবতীর চিত্রের আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যথা শেক্স্পীয়ারের পার্ডিটা, ফ্যানি বার্ণির এভেলিনা, মিসেস্ এজওয়ার্থের বেলিণ্ডা আখ্যায়িকায় ভার্জ্জিনিয়া, জর্জ্জ এলিয়টের সাইলাস মার্ণারে এপি ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্ম্মান ও ইংরেজী সাহিত্যে এবিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

মত কাপড় ধোলাই করিতেন। সুতরাং রাজপরিবারেও অনেকটা গরিবানা চাল ছিল, আচারব্যবহারের অনাড়ম্বর সরলতা বিদ্যমান ছিল। এই সরলতা ও করুণা প্রভৃতি গুণের জন্যই তাঁহাকে কপালকুণ্ডলার সহিত সমশ্রেণীর বলা যায়। ইহা ছাড়া, ঘটনাসাদৃশ্যের জন্যও নাসিকেয়ার আখ্যান এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক।

ঈভ (য়িহুদী ও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মমতে) জগতের আদিনারী, তাঁহার জনক-জননী নাই, তিনি আদমের পঞ্জর হইতে উদ্ভূতা। শকুন্তলা শৈশবে মাতাপিতার পরিত্যক্তা, পিতৃকল্প কণ্ব ও মাতৃসমা গৌতমীর স্নেহে লালিতা। মিরান্ডা শৈশবে পিতৃশত্রু-কর্ত্তৃক জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিতা এবং নৌকাযোগে মহাসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী জনবিরল দ্বীপে উপনীতা। তিনি শৈশবেই মাতৃহারা, পরন্তু জনবিরল দ্বীপে কোন মাতৃসমা নারীর স্নেহও লাভ করেন নাই—তবে স্নেহময় পিতা তাঁহার নিত্যসঙ্গী। হেইডী শৈশবে মাতৃহারা, দস্যু পিতার স্নেহে বর্দ্ধিতা, তিনিও কোন মাতৃসমা নারীর স্নেহ লাভ করেন নাই। কপালকুণ্ডলা ইঁহাদিগের সহিত তুল্যাবস্থা। তিনি শৈশবে দস্যুকর্ত্তৃক মাতাপিতার অঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্না এবং পোতভঙ্গপ্রযুক্ত সমুদ্রোপকূলে পরিত্যক্তা। তথায় তিনি কোন মাতৃসমা নারীর স্নেহে বর্দ্ধিতা হন নাই, পিতৃকল্প অধিকারী ও কাপালিকের সংসর্গে এবং তৎপ্রদত্ত শিক্ষায় তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছে। শকুন্তলা ভিন্ন অবশিষ্ট নায়িকাগণ পিতা বা পিতৃকল্প পুরুষকর্ত্তৃক প্রতিপালিত; তন্মধ্যে আবার মিরান্ডা, হেইডী ও কপালকুণ্ডলা মাতৃসমা নারীর স্নেহবর্দ্ধিতাও নহেন। মিরান্ডা ও কপালকুণ্ডলা যৌবনে সমবয়স্ক সমদুঃখসুখ সখীজনের সাহচর্য্যেও বঞ্চিতা। কেবলমাত্র পুরুষসংসর্গে থাকিয়াও কপালকুণ্ডলা ~~ও মিরান্ডা উভয়েই~~ কোমল-প্রকৃতি। হেইডীর সখী আছে। শকুন্তলা এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা

সৌভাগ্যবতী, তিনি মাতৃসমা গৌতমীর স্নেহে বর্দ্ধিতা এবং যৌবনে সখী-যুগলের সঙ্গলাভে সুখিনী। ইঁহারা সকলেই সভ্যতার কেন্দ্র নগর হইতে বহুদূরে বাস করাতে নাগরিক সভ্যতার কোন সংবাদ রাখিতেন না, অথচ সকলেরই প্রকৃত শিষ্টাচার-জ্ঞানের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব। সকলের সম্বন্ধেই ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের কবিতায় প্রকৃতির উক্তি 'I shall make a Lady of my own' অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

সত্য বটে, মিরাণ্ডা নসিকেয়ার ন্যায় রাজকুমারী, কিন্তু নাটকদ্বয়ে বর্ণিত শেষ দিনের পূর্ব্বে মিরাণ্ডা এ কথা জানিতেন না। (শকুন্তলাও রাজকন্যা, কেন না বিশ্বামিত্র প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন।) হেইডীর পিতা গ্রীকদস্যু, মাতা মূরজাতীয়া। কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণকন্যা এই পর্য্যন্ত বংশপরিচয় পাওয়া যায়। মাতাপিতার বিভিন্ন প্রকৃতির মিশ্রণে হেইডীর চরিত্র কিরূপে গঠিত হইয়াছিল, বায়রণ সে তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন। অবশিষ্ট স্থলগুলিতে কবিগণ এ কথার স্পষ্টভাবে বিচার করেন নাই, প্রকৃতিপ্রদত্ত শিক্ষা এবং মনুষ্যসঙ্গীর সংস্পর্শজাত ও তৎপ্রদত্ত শিক্ষার দিক্ই ফুটাইয়াছেন।

পরন্তু এক নসিকেয়া ভিন্ন অন্যান্য নায়িকার চতুঃ-পার্শ্বে পাত্রপাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক নহে। মিল্‌টনের ঈভের কেবল স্বামিমাত্র সঙ্গী, তাহা ছাড়া অন্য কোন মানবের তখন সৃষ্টি হয় নাই। তবে তিনি কালেভদ্রে জিহোভার বা দেবদূতগণের দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিতেন, আর মুহূর্ত্তের জন্য তিনি সর্পরূপী শয়তানের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। এই মুহূর্ত্তের সংস্পর্শে তাঁহার জীবনে ঘোরতর পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। অন্যথা তাঁহার জীবন নিতান্ত বৈচিত্র্যশূন্য। শকুন্তলা যুগলসখীর নিত্যসঙ্গিনী, কণ্ব ও গৌতমীর সংস্রবেও তাঁহাকে সর্ব্বদাই আসিতে হইত; ইহা ছাড়া ঋষি,

ঋষিপত্নী, ঋষিকুমার প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বিবাহাদির পরে তিনি অল্পকালের জন্য রাজসভায় বহু লোকের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং পরে মরীচির আশ্রমে অল্পসংখ্যক লোকের সংস্রবে আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার প্রথম জীবনে মনুষ্যসংস্পর্শের মাত্রা অত্যধিক নহে। মিরাণ্ডা যে দ্বীপে আবাল্য বাস করিতেন, তথায় তিনি ছাড়া কেবল পিতা ও নররাক্ষস ক্যালিব্যান এই দুইজন মাত্র মনুষ্য ছিল। এই ভাবে আবাল্য-বর্দ্ধিত হইয়া তিনি অপরিচিত রাজপুত্র ফার্ডিন্যাণ্ডের দর্শন পান এবং অল্পক্ষণ পরে সভ্যজগতের আরও বহুলোকের দর্শন পান। হেইডীও মিরাণ্ডার ন্যায় দ্বীপবাসিনী। আখ্যানে সখী ও পিতা ভিন্ন প্রথমে কাহারও উল্লেখ নাই। পরে উৎসবের দিনে বহু দাসদাসীর উল্লেখ আছে। যাহা হউক, কবি তাহাদিগকে যথাসাধ্য উহ্য রাখিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষাও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা আবাল্য কাপালিক ও অধিকারীর তত্ত্বাবধানে লালিতা পালিতা। সেই প্রদেশে অন্য জনমানবের সমাগম ছিল না। শকুন্তলা, নসিকেয়া বা হেইডীর ন্যায় তাঁহার নিত্যসঙ্গিনী সখী নাই। অবস্থা ঠিক মিরাণ্ডার অনুরূপ। কালীমন্দিরে অবশ্য মধ্যে মধ্যে যাত্রী আসিত, কপালকুণ্ডলার তাহাদিগের সংস্পর্শে আসিবার কথা। কিন্তু কবি তাহা উহ্য রাখিয়াছেন। কেবল একবার অধিকারীর এক শিষ্য আসিয়াছিল, তাহার সামান্যমাত্র উল্লেখ অধিকারী ও কপালকুণ্ডলার কথোপকথনের এক স্থলে আছে। পরে অকস্মাৎ নবকুমারের আবির্ভাব ও কপালকুণ্ডলার জীবনের গতিপরিবর্ত্তন। নবকুমারকে এই প্রদেশে আনিতে কবিকে কয়েকজন পাত্র-পাত্রীর সৃষ্টি করিতে হইয়াছে (প্রথম খণ্ডের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে); কিন্তু তাহারা কেহই কপালকুণ্ডলার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। পতিগৃহে যাইবার

পথে কপালকুণ্ডলা মতিবিবি ও ভিক্ষুককে দণ্ডেকের তরে দেখিয়াছিলেন (বাহকগণ বা দোকানদার ধর্ত্তব্য নহে)। পতিগৃহে অবস্থানকালে তাঁহার স্বামী ছাড়া কনিষ্ঠা ননন্দার সহিত সাহচর্য্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। জীবনের শেষ দুইদিন তিনি 'ব্রাহ্মণবেশী' ও কাপালিকের সাক্ষাৎ লাভ করেন। লোকালয়ে বাসকালে অবশ্য আরও কোন কোন লোক তাঁহার দর্শনপথে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ নাই। এমন কি, এইরূপ সংস্পর্শ যথাসম্ভব কমাইবার জন্য, কবি নায়িকার শ্বাশুড়ী, বড় ননদ ও 'ঠাকুর-জামাই'কে পর্য্যন্ত নায়িকার সম্মুখীন করেন নাই।

এই শ্রেণীর নায়িকাদিগের সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য, সরলতা, করুণা প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্‌গুণ দেখা যায়, * বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট অপর একটি চরিত্রেও সেগুলি বর্ত্তমান। এই চরিত্র 'মৃণালিনী'তে চিত্রিত মনোরমা। 'কপালকুণ্ডলা'র অব্যবহিত পরেই 'মৃণালিনী' রচিত হইয়াছিল। সুতরাং 'মৃণালিনী'তে অঙ্কিত মনোরমার চরিত্রে কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের ছায়াপাত আশ্চর্য্য নহে। তবে প্রথম গ্রন্থে কপালকুণ্ডলা প্রধানা পাত্রী বা নায়িকা, দ্বিতীয় গ্রন্থে মনোরমা সে স্থান অধিকার করেন না। মনোরমাকেও কবি কতক পরিমাণে প্রকৃতিদুহিতার উপাদানে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। পরিবেষ্টনীরও কিঞ্চিৎ সমতা দৃষ্ট হয়। মনোরমা শৈশবে মাতৃহীনা, কপালকুণ্ডলা শৈশবে মাতৃপ্রভাব হইতে বিচ্ছিন্না; কপালকুণ্ডলা যেমন লোকসমাজে আনীতা হইয়াও জনবহুল মহানগরে বাস করেন নাই, 'সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন ঔপনগরিক বিভাগে' বাস করিতেন, মনোরমাও

---

* শান্তি, নিশি ও জয়ন্তীর চরিত্র-বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদিগকেও মনুষ্য-সংসর্গের প্রভাব হইতে কতকটা দূরে রাখিয়াছেন। প্রফুল্ল ও শ্রীকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিবার সময়ও কবি তাহাদিগকে লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন।

সেইরূপ 'উপনগরের প্রান্তে উপবনগৃহে' বাস করিতেন। কপালকুণ্ডলা হিজলীতে সমুদ্রকূলে ও সপ্তগ্রামে নদীকূলে অরণ্যবিহারিণী, মনোরমাও গভীর রজনীতে 'বাপীতটে' উপবিষ্টা, মহাবনও তাঁহার অপরিচিত নহে। উভয়েই অপূর্ব্বসুন্দরী, উভয়েই অলৌকিক সরলা, উভয়েই স্নেহময়ী করুণাময়ী, উভয়েরই দুই মূর্ত্তি—সরলা ও গম্ভীরা কপালকুণ্ডলার ভবানী-ভক্তিপ্রভাবিত আত্মবলি ও মনোরমার পতিভক্তিপ্রণোদিত সহমরণ উভয়ই গভীর ধর্ম্মভাবের নিদর্শন। মনোরমা প্রণয়তত্ত্ব ও পত্নীত্বগৌরব বুঝেন, কপালকুণ্ডলা 'ও রস বঞ্চিত'—এইখানেই উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ ও কপালকুণ্ডলার বিশিষ্টতা।

রূপক-ব্যাখ্যা।

'কপালকুণ্ডলা'র আখ্যানবস্তুর সহিত ওডিসির নসিকেয়া-সংক্রান্ত, টেম্‌পেষ্টের মির‍্যাণ্ডা-সংক্রান্ত, ও ডন জুয়ানের হেইডী-সংক্রান্ত অংশের একত্র তুলনা করিলে একটি ঘটনা-সাদৃশ্য চোখে পড়ে,—চারিটি আখ্যানেই বিশাল সমুদ্রতীরে বিপন্ন মানবের সমক্ষে অভয়দাত্রী মূর্ত্তিতে নারীর আবির্ভাব।* জানি না, ইহার রূপকব্যাখ্যা চলে কি না। বিপৎসঙ্কুল চিররহস্যময় সংসার-সমুদ্রের তীরে মানবসন্তানকে অভয় দিবার জন্যই কি নারীর উদ্ভব? নারীই কি জীবনের ধ্রুবতারা? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কি নায়ক নবকুমার বলিবেন?

"সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারা সম।" ['মানসী'—বিদায়]

* থেলুমাতেও নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ সমুদ্রকূলে। তবে নায়ক বিপন্ন নহেন। কিন্তু থেলুমাকে পাইয়া তাঁহারও উদ্দেশ্যহীন জীবন সার্থক হইল।

"ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মত হও!

*　　*　　*　　*

অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও।
অমনি সুন্দর শান্ত, অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওই মত ধীরে ধীরে আমার জীবন তীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী।"

['মানসী'—সন্ধ্যায়]

বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনার ভাবে মনে হয়, তাঁহার মানসপটে এই রূপকটুকু ফুটিয়াছিল। তিনি বলিতেছেন—"সমুদ্রের জনহীন তীরে এইরূপে বহুক্ষণ দুইজনে চাহিলেন, অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?' এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণী-কণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয়বিশিষ্ট হয়। সংসার-যাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত-প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।" * [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।]

(নিম্নরেখ অংশগুলি সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।)

ইহা রূপক নহে কি? নবকুমারের পদ্মাবতী-ঘটিত পূর্ব্বজীবন†

* শেষ কথাগুলিতে 'বঙ্গসুন্দরী'র কবির উক্তি মনে করাইয়া দেয়:—"কথা কহে দূরে দাঁড়ায়ে যখন, সুরপুরে যেন বাঁশরী বাজে।"

† 'নবকুমার বিরাগবশতঃ আর দারপরিগ্রহ করিলেন না।' [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।]

স্মরণ করিলে মনে হয় যে, তিনি জীবনের পথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, পথহারা হইয়া (life a blank) ব্যর্থ-জীবন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"কেহ নাই, আমি শুধু একা ; শুয়ে আছে সঙ্গিহীন প্রাণ
* * * * জীবনের তটবালুকায়।
নিষ্ফল-দিবস অবসান হৃদয়ের হত আশা যত
কোথা আশা, কোথা গীতগান ! অন্ধকারে কাঁদিয়ে বেড়ায়।"

['মানসী'—গোধূলি]

কপালকুণ্ডলা 'মূর্চ্ছাহত হৃদয়ের পরে চিরাগত প্রেয়সীর প্রায়' 'আইস' বলিয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন।

প্রবাস হইতে নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া গৃহে ফিরিলে নবকুমারের জীবন-প্রবাহের গতি ফিরিল। 'তাঁহার প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।...যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা আসিল।... সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল।' [২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।]

আবার উপসংহারে দেখি, নবকুমার যখন জীবনসঙ্গিনীর উপর, জীবনের ধ্রুবতারার উপর, বিশ্বাস হারাইলেন, তখন সেই জীবনের ধ্রুবতারাও খসিল, জীবনতরণীও ডুবিল, উভয়ে সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যে * ভাসিতে ভাসিতে কোথায় গেলেন, কে জানে ? From the great deep to the great deep he goes.

এই রূপকব্যাখ্যা কেহ গ্রাহ্য করিবেন কি না জানি না। অন্যান্য কবির যে কয়েকটি সৃষ্টির সহিত কপালকুণ্ডলার সাদৃশ্যের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

---

* ব্যর্থ-জীবনের আরম্ভে সমুদ্রের ক্ষারজল, কপালকুণ্ডলা-লাভে সার্থক জীবনের শেষে পূত গঙ্গাজল।

মিল্‌টনের ঈভ।

ঈভ য়িহুদি ও খৃষ্টধর্ম্মমতে মানবের আদিজননী। তিনি কপালকুণ্ডলার ন্যায় প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিতা; তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য, সরলতা, কোমল প্রকৃতি, আতিথেয়তা, ধর্ম্মভাব, প্রভৃতি কপালকুণ্ডলারই অনুরূপ। পক্ষান্তরে, তাঁহার চরিত্রে এমন কতকগুলি সদ্‌গুণ বিরাজিত, যে গুলির কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে অস্তিত্ব নাই। ঈভ প্রেমময়ী, লজ্জাশীলা, পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, * পরন্তু হিন্দুস্ত্রীর ন্যায় পতিকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি করেন। কবি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

For softness she and sweet attractive grace ;
He for God only, she for God in him.........
Subjection............
Yielded with coy submission, modest pride,
And sweet, reluctant, amorous delay.

এবং ঈভের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—

What thou bidd'st
Unargued I obey. So God ordains.
God is thy law, thou mine.

ইহা হিন্দুপত্নীর 'পতিহি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ' এই সংস্কারের অনুরূপ।

তিনি আদমের সহিত কথোপকথনে পতিপ্রেমে গদ্‌গদকণ্ঠা। তিনি যখন আদমের নিকট নিজ জীবনের প্রথম স্মৃতি বর্ণনা করিতেছেন, তখন

* কেবল শয়তানের প্ররোচনায় এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি স্বামীর অবাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তজ্জন্য তিনি পরে গভীর অনুশোচনা করিয়াছিলেন।

সেই প্রসঙ্গে বুঝা যায়, তাঁহার প্রেম কত প্রবল ও কেমন অকৃত্রিম। আবার যখন তিনি নিজকৃত পাপের প্রতিফলস্বরূপ কি ভীষণ শাস্তিভোগ করিতে হইবে তাহা অবগত হইলেন, তখন তিনি প্রেমাস্পদ স্বামীকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য একাই সমগ্র দণ্ড নিজের মস্তকে পাতিত করিতে ব্যাকুল হইলেন। আজন্মপরিচিত প্রিয় নন্দনকানন ত্যাগ করার সময় তিনি অবলীলাক্রমে বলিলেন যে স্বামিসঙ্গই তাঁহার সুখ ও স্বর্গ (thou to me art all things under heaven, all places thou)। এখানেও যেন হিন্দুনারী সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই পতিপ্রীতি ও পতিভক্তি কপালকুণ্ডলার চরিত্রে বর্ত্তমান নাই। ইহা আদমের নিত্যসাহচর্য্য ও তৎপ্রদত্ত শিক্ষার ফল নহে, ইহা ঈভের প্রকৃতিগত।

নন্দনকাননে বাসকালে ঈভ জননীর পদবীতে আরোহণ করেন নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার মাতৃভাব জাগরিত হইয়াছিল। তিনি যখন নিজের অনুষ্ঠিত পাপের কঠোর শাস্তির স্বরূপ অবগত হইলেন, তখন তিনি এই পাপের জন্য অজাত সন্তানপরম্পরার শাস্তি নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে আত্মহত্যার প্রস্তাব করিলেন, ইহাতে তাঁহার মাতৃদায়িত্বজ্ঞানের পরা কাষ্ঠা সূচিত হইয়াছে। আবার অনুশোচনার প্রথম তীব্রতা প্রশমিত হইলে, তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বংশীয় সন্তান উক্ত শাস্তির প্রতিবিধান করিবে ঈশ্বরের এই নিদেশ-শ্রবণে তিনি মাতৃত্বগর্ব্বে উৎফুল্ল হইলেন, ইহাও তাঁহার মাতৃভাবের সুন্দর নিদর্শন। বলা বাহুল্য, এই মাতৃভাব কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে নাই।

ঈভ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, শকুন্তলার ন্যায় পশুপক্ষিবৃক্ষলতার সংসর্গে তাঁহার হৃদয় আনন্দময়। প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গে কিন্তু এবংবিধ প্রকৃতির প্রভাবের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। পাপানুষ্ঠানের

পর আজন্ম-পরিচিত প্রিয় বাসস্থান ত্যাগ করিতে হইবে শুনিয়া ঈভের হৃদয় বেদনায় ভরিয়া গেল। এখানেও ঈভ শকুন্তলার সহিত তুলনীয়া। কপালকুণ্ডলা তাঁহার আশৈশব পরিচিত স্থান ত্যাগ করিতে কষ্ট বোধ করিলেন কিনা কবি সে কথার কোন উল্লেখ করেন নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মিল্‌টন ঈভের চরিত্র অঙ্কিত করিবার সময় আদিম-নারী-প্রকৃতির উপাদান বিচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, য়িহুদি জাতি নারীচরিত্র-সম্বন্ধে যে সংস্কার পোষণ করিতেন, বাইবেলের পূর্ব্বভাগে যে সংস্কারের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়, মিল্‌টন পিউরিট্যান্ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়াতে সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঈভের চরিত্রে বহু সদ্‌গুণের সঙ্গে সঙ্গে অদম্য কৌতূহল, নিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবল প্রবৃত্তি, গর্ব্ব, ক্ষমতা-প্রিয়তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, একগুঁয়েমি প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর দোষ নারীপ্রকৃতির মজ্জাগত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই সকল বৃত্তির আতিশয্য থাকাতেই শয়তান তাঁহাকে অত সহজে বিপথগামিনী করিতে পারিয়াছিল এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। কৌতূহল, স্বাধীনতা-প্রিয়তা প্রভৃতি বৃত্তি কপালকুণ্ডলার চরিত্রেও বর্ত্তমান। কপালকুণ্ডলা-চরিত্রেও ঐ সকল বৃত্তির কি শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

কালিদাসের শকুন্তলা।

কালিদাসের শকুন্তলা কণ্ব ও গৌতমীর অভিভাবকতায় তপোবনে পালিতা, কপালকুণ্ডলা কাপালিক ও অধিকারীর অভিভাবকতায় অরণ্যে পালিতা; উভয়েই নাগরিক সভ্যতার সংবাদ রাখেন না, উভয়েরই প্রকৃতিতে অসামান্য সরলতা ও কোমলতা। শারীরিক সৌন্দর্য্যবিষয়েও "কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্'—কালিদাসের এই বাক্য কপালকুণ্ডলা-

সম্বন্ধেও সুপ্রযুক্ত হইতে পারে। 'দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা।' * কিন্তু ঋষির আশ্রমেও মনুষ্য-সমাজের রীতিনীতি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বা প্রভাবশূন্য ছিল না; আশ্রমে কণ্ব-গৌতমী, অন্যান্য ঋষি ও ঋষিপত্নী, ঋষিকুমার, সমবয়স্কা সখী প্রভৃতি লোকসমাগমের অভাব ছিল না। সমাজে, গার্হস্থ্যাশ্রমে, বাস করিতে হইলে কি প্রকার আচরণ করিতে হয়, কণ্ব ও গৌতমী তাহা সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং কেবল যে তাহা শকুন্তলার পতি-গৃহগমন-কালে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না, তাঁহারা নিশ্চিতই শৈশব হইতে তাঁহাকে ধর্ম্ম-শিক্ষা, নীতি-শিক্ষা, আচার-শিক্ষা, বিদ্যা-শিক্ষা † দিয়াছিলেন। আবার অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সখী-যুগলের অবিচ্ছিন্ন সাহচর্য্যেও তিনি মানব-সমাজের রীতিনীতি, মানব-হৃদয়ের নানা বৃত্তি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও নিঃসন্দেহ। সখীদ্বয়ের রঙ্গালাপে বেশ বুঝা যায় যে, প্রেম ও বিবাহ সম্বন্ধে শকুন্তলা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ছিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার নারীপ্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া লইলেও, প্রণয়ের প্রকাশে ও প্রণয়পাত্রের প্রতি আচরণে লজ্জাজড়তা, হৃদয়ভাবগোপনের চেষ্টা, ছলাকলা প্রভৃতিতে মানবসমাজের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা প্রমাণিত হয় না। এ সকলই 'অশিক্ষিতপটুত্ব' বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না।

লজ্জাশীলতা সমাজবদ্ধ মানবের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর। সুতরাং কপালকুণ্ডলার প্রকৃতিতে শকুন্তলার প্রকৃতির তুলনায় অধিকতর সরলতা, সঙ্কোচহীনতা ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

---

* বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা ও মিরান্দা' প্রবন্ধ।

† কপালকুণ্ডলা ও শকুন্তলা উভয়েই লেখাপড়া জানিতেন। 'কপালকুণ্ডলা অধিকারীর ছাত্র, পড়িতে পারিতেন।' [৪র্থ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।] শকুন্তলা সখীগণের প্ররোচনায় প্রণয়লিপি রচনা করিতেছেন (৩য় অঙ্ক)।

কেন না কপালকুণ্ডলার তুলনায় শকুন্তলার সহিত সমাজের সংস্পর্শ নিকটতর। কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার হয় নাই, সুতরাং প্রণয়াবস্থার হাবভাব, ছলাকলা, ব্রীড়াসাধ্বসেরও অবকাশ ঘটে নাই। কিন্তু এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, তিনি প্রেমের প্রভাব অনুভব করিলে মির‍্যাণ্ডার ন্যায় অসঙ্কোচে গুরুজনের সমক্ষে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতেন, শকুন্তলার ন্যায় তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিতেন না। যাহা হউক, এই প্রণয়ের অভাবই কপালকুণ্ডলাচরিত্রের বিশিষ্টতা ও শকুন্তলাচরিত্রের সহিত প্রধান প্রভেদ। শকুন্তলার তুলনায় কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিদুহিতা নামের অধিকতর যোগ্য।

[তবে অবশ্য মহাভারতের শকুন্তলা এবং সমাজে, নগরে, ধনিগৃহে অবস্থিতা রত্নাবলী বা সাগরিকা, মালবিকা, মালতী, ডেস্‌ডেমোনা, জুলিয়েট, আইমোজেন, প্রভৃতির তুলনায় কালিদাসের শকুন্তলাকে প্রকৃতিদুহিতা বলা যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে একথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমরা শকুন্তলা মিরাণ্ডা কপালকুণ্ডলা প্রভৃতির চরিত্রে যে অসামান্য কোমলতা ও সরলতা-দর্শনে মুগ্ধ হই, সেই কোমলতা ও সরলতা সমাজ ও সভ্যতার ক্রোড়ে লালিতা নারীরও অপ্রাপণীয় নহে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট তিলোত্তমা মৃণালিনী মনোরমা কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি চরিত্র ও শেক্‌স্‌পীয়ারের সৃষ্ট জুলিয়েট ডেস্‌ডেমোনা কোর্ডিলিয়া আইমোজেন প্রভৃতি চরিত্র এবং সংস্কৃত নাটকে অঙ্কিত রত্নাবলী বা সাগরিকা, মালবিকা, মালতী প্রভৃতি চরিত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে সমাজের প্রভাব হইতে দূরে অবস্থিতা নারীদিগের চরিত্রে এই দুইটি গুণ সমধিক পরিমাণে বিকাশ লাভ করে, ইহাই এক্ষেত্রে বক্তব্য।]

তপোবনস্থিত পশু-পক্ষি-তরুলতার প্রতি শকুন্তলার স্নেহপ্রীতি হইতে বুঝা যায়, তিনি প্রকৃতির প্রভাবে কতদূর প্রভাবিতা এবং তাঁহার হৃদয়

কত কোমল ও করুণাপূর্ণ। তরুমূলে জলসেচন, বন-জ্যোৎস্নাকে ভগিনী-সম্বোধন, মৃগশিশুপালন প্রভৃতি হইতে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলার করুণা বিপন্ন মানবের জন্য উৎসারিত হয়, শকুন্তলার করুণা মাতৃহীন মৃগশিশুর জন্য উৎসারিত হয়। এ অংশে শকুন্তলার হৃদয় আরও সুকুমার নহে কি? কপালকুণ্ডলার মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব অতি সামান্যমাত্র সূচিত আছে। কিন্তু তাঁহার পশু-পক্ষি-তরু-লতার প্রতি প্রীতির পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র একেবারেই দেন নাই। (আল-বালে জলসেচন প্রভৃতি কার্য্য অবশ্য কৃত্রিম উদ্যানেই সম্ভবে, স্বভাবজাত অরণ্যে সম্ভবে না।) কপালকুণ্ডলা যখন আশৈশব পরিচিত—'পৃথিবীতে যে জন তাঁহার একমাত্র সুহৃদ্'—অধিকারীর নিকট বিদায় লইলেন, তখন কপালকুণ্ডলা ও অধিকারী উভয়েই কাঁদিলেন। এ দৃশ্য করুণ। (বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদের শীর্ষে শকুন্তলার প্রতি কণ্বের প্রবোধ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।) কিন্তু শকুন্তলার করুণ বিদায়-দৃশ্যের তুলনা নাই; শকুন্তলা তরু-লতা-পশু-পক্ষীর জন্য কাঁদিয়াছিলেন, তাহারাও যেন তাঁহার সঙ্গে সমবেদনা দেখাইয়াছিল। বাহ্যপ্রকৃতির সহিত এই একাত্মতা কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে অধিকতর পরিমাণে থাকিবার কথা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতি-দুহিতা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের এ দিক্‌টা অতি ক্ষীণ রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন।

শকুন্তলার আখ্যানের সহিত কপালকুণ্ডলার আখ্যানের অতি অল্প বিষয়েই মিল আছে; সুতরাং তুলনায় সমালোচনা চলে না। তবে যেটুকু সাদৃশ্য আছে, তাহা প্রদর্শনযোগ্য। পতিকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার আহত সতীত্বগর্ব্ব তাঁহার তেজস্বিতার পরিচয় দেয়। পতির হৃদয়ে সন্দেহের ভাব দেখিয়া কপালকুণ্ডলাও এইরূপ তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন। শকুন্তলার প্রণয়-সঞ্চার মধুর, তাঁহার পতি-প্রীতি গভীর, পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা

হইয়াও তিনি পতির জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ পতির সংবাদ লইতে গোপনে সানুমতীকে (মিশ্রকেশীকে) পাঠান ; শেষ অঙ্কে মিলনদৃশ্যে তাঁহার পতিগতপ্রাণতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মাতৃভাবও অতি সুন্দর, অতি মধুর ; মৃগশিশুপালনে ইহার অঙ্কুর, শিশুপুত্র সর্ব্বদমনের লালন-পালনে ইহার পরিণতি। বলা বাহুল্য, শকুন্তলাচরিত্রের এই সকল দিক্ কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে অবিদ্যমান।

হোমারের নসিকেয়া।

হোমারের ওডিসিতে বর্ণিত বিষয়টি অনেকের সুবিদিত নহে বলিয়া সংক্ষেপে বলিতেছি।

বিখ্যাত গ্রীক বীর ওডুসিউস্ অর্থাৎ ইউলিসিস্ যানভঙ্গের পরে আইনো-নাম্নী জলদেবীর কৃপায় নিরাপদে সমুদ্রকূলে উপনীত হইলেন। তাঁহার জীবনরক্ষা হইল, কিন্তু তাঁহার সঙ্গিগণ সকলেই অতল সমুদ্রজলে সমাধিলাভ করিল। (নবকুমারের সমুদ্রতটে একাকী পরিত্যক্ত হওয়ার বৃত্তান্ত অবশ্য ইহা হইতে বিভিন্ন।) ইউলিসিস্ ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নগ্ন অবস্থায় উপকূলবর্ত্তী বনমধ্যে নিদ্রিত হইলেন।

এদিকে ইউলিসিসের রক্ষাকর্ত্রী দেবী এথিনি পূর্ব্বরাত্রে রাজকন্যা নসিকেয়াকে স্বপ্ন দিলেন যে তাঁহার বিবাহকাল সমাসন্ন, অতএব তিনি বিবাহোৎসবের পূর্ব্বে মাতাপিতা-ভ্রাতার ও নিজের বস্ত্র পরিষ্কৃত করুন। তদনুসারে রাজকন্যা মাতাপিতার অনুমতি লইয়া সখীগণ-সঙ্গে শকটারোহণে রাশীকৃত বস্ত্র লইয়া সমুদ্রতীরে গেলেন। সমুদ্রের ক্ষারজল এই কার্য্যের বিশেষ উপযোগী। এই শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অবগাহন-স্নান ও মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে রাজকন্যা ও সখীগণে মিলিয়া কন্দুকক্রীড়ায় রত হইলেন।

এই ক্রীড়ারঙ্গের কোলাহলে ইউলিসিসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বুঝিলেন শব্দ নারীকণ্ঠনিঃসৃত। তিনি আশ্রয়প্রার্থনার এই সুযোগ ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না, অথচ সম্পূর্ণ উলঙ্গদেহে কিরূপে মহিলাকুলের সমীপে আসেন? শেষে একটি পত্রবহুল বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া তাহার অন্তরালে নিজদেহ লুক্কায়িত রাখিয়া তিনি তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। (নবকুমার যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তখন তিনি কাপালিকের কৃপাভিক্ষা করিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলার নহে। পরেও তাঁহাকে কপালকুণ্ডলার করুণা প্রার্থনা করিতে হয় নাই, করুণাময়ী নিজস্বভাবগুণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। হোমারের নায়িকা একাকিনী নহেন, সখীগণ-পরিবৃতা।) এই বিভীষিকা-দর্শনে সখীগণ দূরে পলায়ন করিল। কেবল রাজকন্যা স্থির রহিলেন। ইউলিসিসের অসাধারণ বাগ্মিতার কথা সকলেই জানেন। তিনি উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে রাজকন্যার রূপের প্রশংসা করিয়া (নবকুমার কপালকুণ্ডলার রূপে মুগ্ধ হইলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন নাই) তাঁহার দয়ার উদ্রেকের জন্য নিজের দুরবস্থার কাহিনী বর্ণনা করিয়া, আশ্রয় ও বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন এবং রাজকন্যার ভাল বর হইবে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন। কুমারী প্রসন্না হইয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং তাঁহাকে রাজধানীর পথ দেখাইয়া দিবেন এরূপ আশ্বাস দিলেন।

তাহার পর রাজকন্যা পলায়িতা সঙ্গিনীদিগকে আহ্বান করিলেন এবং অতিথির বস্ত্রপরিধান ও স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিল। ইউলিসিস্ (নবকুমারের ন্যায়) সুরূপ নব্যযুবক ছিলেন না, কিন্তু এক্ষণে স্নানান্তে শরীরের ক্লেদাপগমে, সুবেশ-পরিধানে ও তাঁহার রক্ষাকর্ত্রী দেবীর প্রসাদে তিনি যেন দিব্যদেহ ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে নসিকেয়া সখীগণকে সরলভাবে বলিলেন,

"আহা আমার বরটি যেন এমনি সুপুরুষ হয়!" ইউলিসিস্ স্নানাহারে তৃপ্ত হইলে রাজকন্যা নগরে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্‌যোগ করিলেন ও আগন্তুককে বলিলেন, "কুমারীর সহিত অপরিচিত পুরুষ দেখিলে পাঁচজনে পাঁচকথা বলিবে, অতএব আপনি যতক্ষণ নগরের সীমা পর্য্যন্ত না পৌছান ততক্ষণ আমার শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিবেন; পরে আমরা নগরে প্রবেশ করিলে একাকী রাজভবন-দ্বারে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন।" তদনন্তর রাজকন্যা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই পর্য্যন্ত ষষ্ঠ সর্গে বর্ণিত।

ইউলিসিস্‌কে (নবকুমারের ন্যায়) আর নূতন কোন বিপদে পড়িতে হয় নাই (কেন না রাজা কাপালিকের ন্যায় ক্রূরকর্ম্মা নহেন, বরং অধিকারীর ন্যায় দয়ালুপ্রকৃতি)। বরঞ্চ রাজা তাঁহাকে স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং তিনি সমুদ্রতীরে রাজকন্যার নিকট কিরূপ আতিথেয়তা লাভ করিয়াছিলেন তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার বীরত্ব প্রভৃতি গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইউলিসিস্ এ প্রস্তাবে কি উত্তর দিলেন, হোমার তদ্‌বিষয়ে নীরব।

আর একবার অষ্টম সর্গে আমরা রাজকন্যার দর্শন পাই। তাঁহার কথা কয়টী বড় করুণ। তিনি অতিথিকে বলিলেন, 'যখন দেশে ফিরিবেন, এক একবার আমার কথা মনে করিবেন, কেন না আমিই আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছি।' ইউলিসিস্ তাঁহাকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে দেবীজ্ঞানে পূজা করিবেন এইরূপ উত্তর দিলেন। রাজকুমারীর হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার হইয়াছিল কিনা, হোমারের বৃত্তান্ত হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। ইউলিসিস্ সাধ্বী পত্নী পেনিলোপীর প্রতি অবিচলিত অনুরাগ-বশতঃই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক, উপকারিণী কুমারীকে

(নবকুমারের ন্যায়) বিবাহ করিয়া দেশে লইয়া গেলেন না। (তবে রাজকন্যাও কপালকুণ্ডলার মত দুরন্ত কাপালিকের হস্তে নিগৃহীত হইবেন এরূপ আশঙ্কা ছিল না।)

এই বৃত্তান্ত হইতে বুঝা গেল, রাজকুমারী প্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার মতই সরলা ও দয়াবতী, তবে লোকাচার সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে; 'পাছে লোকে কিছু বলে' তৎসম্বন্ধে শকুন্তলার ন্যায় তাঁহার বেশ ভয়ও আছে। ইহা নগরবাসিনী রাজকন্যার পক্ষে স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, তিনি যে 'আমার যেন এমনই বর হয়' এই কথা অকপটে সখীগণকে বলিলেন, ইহা তাঁহার অসামান্য সরলতার পরিচয়। আবার তিনি অতিথির প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এই কথা অতিথিকে স্পষ্টভাবে বলিলেন, ইহা অহমিকা বা প্রগল্‌ভতা নহে, ইহাও তাঁহার অসামান্য সরলতার পরিচয়।

কপালকুণ্ডলার ন্যায় নসিকেয়ার চরিত্রও নারীচরিত্র হিসাবে অসম্পূর্ণ, কেন না এই চরিত্রে কেবল কুমারীজীবনের চিত্র আছে; সুতরাং পতি-প্রীতি, পতিভক্তি ও অপত্যস্নেহ—নারী-প্রকৃতির এই সকল অংশ প্রদর্শিত হয় নাই। তবে যে কারণে কপালকুণ্ডলার বিবাহিত জীবনেও এ সকল বৃত্তির অভাব, নসিকেয়ার প্রকৃতিতে সে কারণ বিদ্যমান নাই। যাহা হউক, রমণীয় হইলেও কপালকুণ্ডলার সহিত পরিচয়ের পর এ চরিত্র আমাদের চোখে লাগে না। কিন্তু গ্রীক কবির সমালোচকগণ নায়িকার সরলতা, সৌকুমার্য্য ও কোমল প্রকৃতির সহিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সুচারু সামঞ্জস্যের ('harmonious combination of grace, tenderness and delicacy with sense and tact') শতমুখে প্রশংসা করেন। এই শ্রেণীর নায়িকার চরিত্রবর্ণনে, ইউরোপের আদিকবি হোমারের নিকট ইংরেজ কবি শেক্‌স্‌পীয়ার ও বায়রন কতদূর ঋণী তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ দুইটি হইতে বুঝা যাইবে।

শেক্‌স্‌পীয়ারের মিরাণ্ডা।

বিশাল বারিধিবক্ষে একটি রম্য দ্বীপ—তথায় অলোকসামান্যা সুন্দরী পঞ্চদশী মিরাণ্ডা বাস করেন, সঙ্গীর মধ্যে স্নেহময় পিতা ও নররাক্ষস ক্যালিব্যান। মিরাণ্ডা শৈশবে পিতৃশত্রু-কর্তৃক পিতার সহিত দেশ হইতে নির্ব্বাসিতা ও নৌকাযোগে এই দ্বীপে উপনীতা। কপালকুণ্ডলা যানভঙ্গ-প্রযুক্ত দস্যুকর্তৃক শৈশবে এই প্রদেশে পরিত্যক্তা। মিরাণ্ডার ন্যায়, ষোড়শী রূপসী কপালকুণ্ডলাও সমুদ্রকূলবাসিনী, তাঁহারও কেবল দুইজন সঙ্গী—স্নেহময় অধিকারী ঠাকুর ও নররাক্ষস কাপালিক। মিরাণ্ডার পিতা জ্ঞান ও দয়ায় অধিকারীর সহিত তুলনীয়; পক্ষান্তরে তাঁহার কুহকবিদ্যা অঘটনঘটনপটীয়সী, এ বিষয়ে তিনি তন্ত্রসিদ্ধ কাপালিকের সহিত তুলনীয়; তাঁহার দুই একটি অনুষ্ঠানও প্রথমদৃষ্টিতে কাপালিকের ন্যায় নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হয়। এ ভাবে দেখিলে বলা যাইতে পারে যে, প্রস্‌পেরো-চরিত্র দ্বিধাবিভক্ত হইয়া অধিকারী ও কাপালিকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মিরাণ্ডার চরিত্রে প্রকৃতির পরিবেষ্টনীর প্রভাব আছে (যদিও কালিদাসের শকুন্তলার ন্যায় তাহা স্পষ্টীকৃত নহে), পরন্তু পিতৃদত্ত শিক্ষায়ও তাঁহার চরিত্র নিয়মিত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলার বেলায়ও প্রকৃতির প্রভাব আছে (এক্ষেত্রেও তাহার স্পষ্ট বর্ণনা নাই), আবার অধিকারী ও কাপালিক-প্রদত্ত শিক্ষায়ও তাঁহার চরিত্র নিয়মিত হইয়াছে। উভয়েরই সমাজ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, অথচ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাও নাই—তবে অভিজ্ঞতা গৌণভাবে লব্ধ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগের হৃদয়ের কোমলতা কঠোর জীবনসংগ্রামের সঙ্ঘর্ষে নষ্ট হয় নাই। উভয়েই সৌন্দর্য্যপ্রতিমা, উভয়েই করুণাময়ী, উভয়েই সরলা, উভয়েই নারীসুলভ মাধুর্য্যমণ্ডিতা, উভয়েই পবিত্রচরিত্রা, উভয়েই

কৃত্রিমলজ্জাশূন্যা কিন্তু 'লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা,' * তাহা উভয়েই আছে।

শেক্স্পীয়ারের নাটকে পিতা ও কন্যার কথোপকথনে দেখা যায় যে, পিতার পূর্ব্বজীবনের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে মিরাণ্ডার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, করুণা ও সমবেদনার পারাবার উথলিয়া উঠিতেছে। বিপন্ন অর্ণবপোতের আরোহীদিগের জন্যও তাঁহার উৎকণ্ঠা প্রবল। যদিও ফার্ডিন্যাণ্ড প্রস্পেরোর গুণেই সামুদ্রিক বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তথাপি আমরা যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ পাই তখন তিনি মিরাণ্ডার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিয়াছেন ইহাই দেখি। নূতন মানুষ দেখিয়া মিরাণ্ডা বিস্ময় ও প্রশংসাপূর্ণ চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন ও নিজের হৃদয়ভাব অকপটে পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বভাবানুগত। কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে প্রথম দেখিয়া করুণায় কাতর হইলেন, ইহাই দেখা যায়। পক্ষান্তরে মিরাণ্ডার হৃদয়ে যুগপৎ করুণা ও প্রেমের সঞ্চার হইল † ('একই সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা')। রূপকথায় রাক্ষস-পালিতা কন্যাদিগকেও বিপন্ন যুবকের প্রতি এইরূপ দয়াবতী ও প্রণয়-শালিনী দেখা যায়। গ্রীক্ পুরাণে মিডিয়া, এরিয়াড্নি প্রভৃতি কুমারী-দিগেরও এই প্রকৃতি। কিন্তু কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে কেবল করুণা,—প্রেমের স্থান নাই, সুতরাং তাঁহার পরোপকার-প্রবৃত্তি নিঃস্বার্থ। এইখানেই কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের বিশিষ্টতা।

উভয়েই বিপন্ন যুবকের বিপন্নিবারণে চেষ্টিত হইয়া পিতার বা পালক-পিতার ক্রোধোদ্রেক করিয়াছেন এবং তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পরহিতে প্রাণ

---

* বঙ্কিমচন্দ্র—'শকুন্তলা ও মিরান্দা' প্রবন্ধ।

† 'I pity you'. 'That's a degree to love.' **Shakespeare.** 'Pity melts the mind to love.' **Dryden.**

ঢালিয়া দিয়াছেন, তবে প্রস্‌পেরোর ক্রোধ কৃত্রিম, কাপালিকের ক্রোধ প্রকৃত। করুণা ও প্রেমের অতিশয্যে মিরান্‌ডা প্রণয়ভাজনের শাস্তি নিজে মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত, প্রণয়ের প্রতিদান পাইয়া কৃতার্থা, প্রণয়জ্ঞাপনে সঙ্কোচ-সাধ্বসহীনা, হৃদয়বিনিময়ে গদ্‌গদকণ্ঠা, এমন কি পিতার নিকট প্রণয়াস্পদের পক্ষসমর্থন করিতে দ্বিধাশূন্যা। এই অসঙ্কোচ প্রগল্‌ভতা নহে, ইহা অসামান্য সরলতা। উভয়েই পিতার বা পালক-পিতার অবাধ্য হইয়া বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ব্যগ্র, তবে মিরান্‌ডা শুধু বিপন্নের প্রতি দয়াবশতঃ এইরূপ করেন নাই। তাঁহার নবোন্মেষিত প্রণয়ই তাঁহাকে এ পথে পরিচালিত করিয়াছিল।

এক্ষেত্রে যদিও মিরান্‌ডার কার্য্যে সমাজের নিয়মানুবর্ত্তিতার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু অপর বহু স্থলে দেখা যায়, লোকাচার সমাজবিধি নরচরিত্র সম্বন্ধে মিরান্‌ডার জ্ঞান কপালকুণ্ডলা অপেক্ষা অধিক। তাঁহার পিতার সহিত কথোপকথন হইতে বুঝা যায় যে, তিনি শঠতা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানহীনা নহেন। তিনি ক্রীড়াকালে কপটতার জন্য ফার্ডিন্যাণ্ডকে অনুযোগ করিতেছেন, পরন্তু যে ক্রীড়ায় মার্জ্জিত বুদ্ধির প্রয়োজন, সেই চতুরঙ্গক্রীড়ায় অভিজ্ঞা। পিতৃদত্ত শিক্ষার গুণে তিনি ইতালীয় সভ্যতার অনেক সংস্কারের অধিকারিণী হইয়াছেন। কপালকুণ্ডলা বিবাহ কাহাকে বলে বুঝিতেন না, মিরান্‌ডা স্বামি-স্ত্রী-সম্বন্ধ বুঝেন, আত্মদানকালে তাঁহার উচ্চারিত বাক্য হইতে ইহা প্রতীয়মান। ইহা ছাড়া আরও দুই একটি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার এসব সম্বন্ধে জ্ঞান কপালকুণ্ডলা অপেক্ষা স্পষ্টতর। এভাবে দেখিলে 'প্রকৃতিদুহিতা' নামে মিরান্‌ডা অপেক্ষা কপালকুণ্ডলার দাবী বেশী। মাতৃভাব বিবাহান্ত নাটকে বিকসিত হইবার কথা নহে, সুতরাং শেক্‌স্‌পীয়ারের এই নাটকে

ইহার কোন প্রসঙ্গই নাই। এ হিসাবে নসিকেয়ার ন্যায় এ চরিত্রও অসম্পূর্ণ। তবে যথাসময়ে নসিকেয়া ও মিরাণ্ডার প্রকৃতিতে পতিপ্রীতি ও অপত্যস্নেহের বিকাশ হইবে ইহা অসঙ্কোচে বলা যায়। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতিতে কিন্তু এ সকল উপাদানের সম্পূর্ণ অভাব।

বায়রনের হেইডী।

হেইডীর বৃত্তান্ত বায়রনের ডন জুয়ান কাব্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গে বর্ণিত। এই কাব্য একটি অদ্ভুত প্রণালীতে লিখিত,—গম্ভীর করুণ বা মধুর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মিশ্রিত, মধ্যে মধ্যে বহু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বিবৃত। তথাপি হেইডীর আখ্যানটি কবিত্বপূর্ণ, মধুর, মর্ম্মভেদী করুণরসে অভিষিক্ত। কবি হোমার-বর্ণিত ইউলিসিস্-নসিকেয়ার ব্যাপার, ভার্জ্জিল-বর্ণিত ঈনিয়াস্-ডাইডোর ব্যাপার ও শেক্স্‌পীয়ার-বর্ণিত ফার্ডিন্যাণ্ড-মিরাণ্ডার ব্যাপার, এই তিনটি ব্যাপারের কথা স্মরণ রাখিয়া কাব্যের এই অংশ লিখিয়াছেন ইহা বেশ বুঝা যায়। হেইডীর কাহিনী কপালকুণ্ডলার কাহিনী হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন, তথাপি উভয় ব্যাপারে কিছু সাদৃশ্য আছে তাহা প্রসঙ্গক্রমে দেখাইব।

হোমারের প্রাচীন কাব্যের ন্যায় এই আধুনিক কাব্যও সকলের সুপরিচিত নহে। তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অংশের স্থূল মর্ম্ম দিতেছি।

কাব্যের নায়ক ডন জুয়ান, নবকুমার ও ফার্ডিন্যাণ্ডের ন্যায় নবা যুবক, সুপুরুষ, উচ্চবংশজ, সভ্যভব্য, সাহসী, ভাবপ্রবণ। কিন্তু তাঁহার চরিত্র কলঙ্কশূন্য নহে; সে কুৎসিত কথা আর খুলিয়া বলিব না। ডন জুয়ান পোতভঙ্গ হওয়াতে কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করিয়া ইউলিসিসের ন্যায় সমুদ্রকূলে একটি দ্বীপে কূল পাইলেন। সঙ্গিগণ সকলেই সমুদ্রতলে সমাধিলাভ করিল। তিনিও ইউলিসিসের ন্যায় নগ্নদেহ। (এই পর্য্যন্ত

নবকুমার ও ফার্ডিন্যাণ্ডের অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও অনেকটা মিল আছে।) ডন জুয়ান মূর্চ্ছিত অবস্থায় সৈকত-ভূমিতে শয়ান, এমন সময়ে ঐ দ্বীপের অধিবাসিনী জলদস্যুদুহিতা হেইডী তথায় উপনীতা। (হেইডী জলদস্যুদুহিতা। পক্ষান্তরে কপালকুণ্ডলা 'বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা তৎকালে সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন'।) তখন সন্ধ্যাকাল। ('কপালকুণ্ডলা'রও নায়কনায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ সমুদ্রতীরে সন্ধ্যাকালে, হোমার ও শেক্স্‌পীয়ারে সন্ধ্যাকালে নহে।) হেইডী কপালকুণ্ডলা-শকুন্তলা, মিরান্দা-নসিকেয়ার ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দরী, সরলা, কোমলহৃদয়া। কিন্তু তিনি কপালকুণ্ডলা বা মিরান্দার ন্যায় একাকিনী নহেন, সঙ্গে সখী বা পরিচারিকা; পরিচারিকাও যুবতী, তবে নায়িকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োধিকা। নায়িকা বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকার ন্যায় নিরাভরণা নহেন, বেশের পারিপাট্য ও ভূষণের প্রাচুর্য্য যথেষ্ট; তাঁহার পিতার বহু দাসদাসী, গৃহ বিলাসোপকরণে পূর্ণ।

মূর্চ্ছিত যুবক জাগরিত হইয়া এই করুণাময়ী শুশ্রূষাপরায়ণা সপ্তদশী সুন্দরীর মুখখানি ('a lovely female face of seventeen') দেখিলেন। যুবতী ঔষধ-পথ্য সেক-তাপ দ্বারা যুবকের সেবায় ব্যাপৃতা, সখী সাহায্যকারিণী। পিতার দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবার জন্য নায়িকা বিপন্ন যুবককে একটি গুহার মধ্যে লুক্কায়িত রাখিলেন। (গুহা ডাইডো-ঈনিয়াসের বৃত্তান্তের অনুকরণে কল্পিত।) শেক্স্‌পীয়ারের নাটকের ন্যায় এক্ষেত্রেও দয়ার সমকালেই যুবতীহৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইল; যুবকও উপকারিণীর অনুরাগী হইলেন। সরলা মুগ্ধা সমাজের কৃত্রিম প্রথায় অনভ্যস্তা, তিনি সরল মনে অনুরাগলক্ষণ প্রকাশ করিলেন। প্রেমিকা প্রত্যহ প্রত্যূষে সখীসঙ্গে যুবকের সহিত মিলিত হইতেন,

মাতার ন্যায় যত্নে যুবকের শুশ্রূষা করিতেন, যুবক নিদ্রিত হইলে অনিমেষ-লোচনে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতেন। প্রথম প্রথম প্রেমালাপের বিঘ্ন হইত, কেন না তাঁহারা পরস্পরের ভাষা বুঝিতেন না, কিন্তু যুবক যুবতীর মধুর কণ্ঠস্বরে মোহিত হইতেন, আর ইঙ্গিত ও চোখের ভাষা দ্বারা ভাব-প্রকাশ হইত। ক্রমে সুন্দরী শিক্ষয়িত্রীর নিকট যুবকের ভাষাশিক্ষা হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের অন্যোন্যানুরাগও গাঢ়তর হইল।

একমাস এইরূপে কাটিল। দস্যুপতি এইবার লুণ্ঠন-উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করিলেন। নায়িকার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি অন্য অভিভাবক কেহ ছিলেন না, সুতরাং এখন প্রেমিকযুগল নিরঙ্কুশ। তাঁহারা এক্ষণে মনের সুখে সৈকতভূমিতে চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনীতে বাহুবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেন। গোধূলিলগ্নে (কপালকুণ্ডলার বিবাহ স্মর্ত্তব্য) জনহীন সমুদ্রকূলে অনন্ত আকাশতলে তাঁহাদিগের 'মন্ত্রপূতি ব্যতীত বিবাহ' হইল; ইহাতে বিবাহমন্ত্র নাই, চিরপ্রেম-প্রতিশ্রুতি নাই; ইহা যেন ইডেনের নন্দন-কাননে আদম ও হবার মিলন, যেন প্রকৃতির নিয়মে কপোত-কপোতীর, চক্রবাক-চক্রবাকীর প্রীতিসম্ভাষণ। সন্ধ্যাতারা এই মিলনের মঙ্গলদীপ, সমুদ্র সাক্ষী, নির্জ্জনতা পুরোহিত, গুহা বাসরশয্যা।

কিছুদিন পরে প্রেমিক-যুগলের সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন (অলীক) সংবাদ আসিল, জলদস্যু আর ইহলোকে নাই। তাহার পর একদিন নৃত্যগীত উৎসবের শব্দে দস্যুভবন মুখরিত, দীয়তাং ভুজ্যতাং অবিরত চলিতেছে, এমন সময়ে জলদস্যুর পুনরাগমন। তিনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়া লুক্কায়িত রহিলেন। এদিকে উৎসবান্তে দিনশেষে প্রেমিকযুগলের হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ, এমন সময়ে উভয়েরই হৃদয় কি-জানি-কেন কম্পিত হইল; কি একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় ক্ষণিক বিষাদের সঞ্চার হইল; আবার

সেই প্রদোষ-কাল! (এইখানে * প্রদোষকালের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। 'কপালকুণ্ডলা'য়ও প্রদোষকালের বার বার উল্লেখ আছে।)

যাহা হউক, এই ক্ষণস্থায়ী বিষাদ দূর হইলে তাঁহারা প্রেমালাপের পর নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাবশে হেইডী বিপদের পূর্ব্বসূচনা-স্বরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। (কপালকুণ্ডলার যাত্রাকালে দুর্নিমিত্তদর্শন ও পরে স্বপ্নদর্শন স্মর্ত্তব্য)। † স্বপ্নে তিনি চীৎকার করিয়া জাগরিতা হইলেন; জাগরিতা হইয়া দেখিলেন, (কাপালিকেরই ন্যায়) নৃশংস ও ভীষণদর্শন জলদস্যু তাঁহাদিগের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছে; চীৎকারশব্দে ডন জুয়ানেরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল, তিনি বিপদ্ দেখিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন। (নবকুমারও সাহসী ও বলবান্ ছিলেন; কিন্তু কাপালিকের বলের তুলনায় তিনি শিশুর ন্যায় দুর্ব্বল ছিলেন।) হেইডী প্রথমে পিতার নিকট অকপটে সকল কথা স্বীকার করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ফলোদয় হইল না। তিনি পিতাকে প্রণয়িবধোদ্যত দেখিয়া পিতার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কোমলা বালার এখন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! ওদিকে দস্যুপতির আজ্ঞায় সশস্ত্র অনুচরগণ ডন জুয়ানকে আক্রমণ করিল, সাহসী যুবকের অস্ত্রাঘাতে কেহ কেহ হত হইল; যুবক নিজে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ, দস্যুহস্তে বন্দী হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হইলেন। দস্যুপতি কন্যাকে সবলে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রবল উত্তেজনায় কন্যার শিরা ছিন্ন হইল, তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন।

ভগ্নহৃদয়া হেইডীর শেষ অবস্থা দারুণ শোকাবহ। তিনি অর্দ্ধচেতন অর্দ্ধঅচেতনভাবে, দ্বাদশ দিন শয্যাগতা, নিরাহারা, নিরালম্বা, বাক্শূন্যা,

* তৃতীয় সর্গ ১০২—১০৮ ষ্ট্যান্জা।

† কপালকুণ্ডলা ১ম খণ্ড শেষ পরিচ্ছেদ ও ৪র্থ খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ। ডন জুয়ান চতুর্থ সর্গ ৩১—৩৫ ষ্ট্যান্জা।

উন্মাদিনী, লুপ্তস্মৃতি। শেষদিন বীণাধ্বনি ও প্রেমগীতি শুনিয়া তাঁহার মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞানসঞ্চার হইল, পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল, চক্ষুঃ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। প্রবল উত্তেজনায় অভাগিনী শয্যা-ত্যাগ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় গৃহস্থিত ব্যক্তিদিগের দিকে ধাবিত হইল। তাহার পর অবসাদ—ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

নায়িকার দুর্দ্দম প্রেম ও সেই প্রেমের শোচনীয় পরিণাম 'কপাল-কুণ্ডলা'র আখ্যানে নাই। হেইডীর 'মন্ত্রপূতি-ব্যতীত বিবাহে'র পরিবর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার নায়িকার শাস্ত্রোক্ত বিবাহ-সংস্কারের আয়োজন করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতিতে প্রেমের বিকাশ হয় নাই, পক্ষান্তরে বায়রনের নায়িকার প্রকৃতিতে গভীর ধর্ম্ম-ভাবের লেশমাত্রও নাই; বর্ত্তমান কাব্যের নায়িকার সহিত এই প্রভেদ সুস্পষ্ট। তথাপি উভয় আখ্যানেরই পরিণাম দারুণ শোকাবহ, এ বিষয়ে মিল আছে। কাপালিকের নিষ্ঠুরতা ও জলদস্যুর নিষ্ঠুরতায় কিছু মিল আছে। পক্ষান্তরে উভয় নায়িকার ও উভয় নায়কের আচরণে বিস্তর প্রভেদ। হেইডীর প্রকৃতির সহিত কপালকুণ্ডলার প্রকৃতির বিস্তর প্রভেদ আছে, কিন্তু উভয়েই সরলা ও করুণাময়ী। উভয়ত্রই নায়ক-নায়িকার প্রথম-দর্শনের সময়ে নায়ক বিপন্ন, নায়িকা বিপন্নের প্রতি করুণাবতী। হেইডীর চরিত্র মাতাপিতার চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবিত, কপালকুণ্ডলার চরিত্র কাপালিক ও অধিকারীর সংসর্গ এবং তাঁহাদিগের প্রদত্ত শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত। হেইডী প্রেমের প্রভাবে নিষ্ঠুর পিতার হস্ত হইতে নায়ককে উদ্ধার করিতে ব্যগ্র, কপালকুণ্ডলা করুণার প্রভাবে নিষ্ঠুর পালক-পিতার হস্ত হইতে নায়ককে উদ্ধার করিতে ব্যগ্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কপালকুণ্ডলা ও শ্যামা নামের বিচার।

বঙ্কিমচন্দ্র তিলোত্তমা, মৃণালিনী, মনোরমা, রাধারাণী, ইন্দিরা, চঞ্চলকুমারী প্রভৃতি কবিত্বময় মাধুর্য্যপূর্ণ নাম অনবগত ছিলেন না, অথচ নায়িকার 'কপালকুণ্ডলা' এই বিকট নাম নির্ব্বাচন করিলেন কেন? আবার তিনি অমলা, বিমলা, নির্ম্মলকুমারী, বসন্তকুমারী, কমলমণি, সুন্দরী, চাঁপা, ফুলমণি, প্রভৃতি নায়িকা-সঙ্গিনীগণের সুশ্রাব্য নাম থাকিতে কপালকুণ্ডলার গার্হস্থ্যজীবনের সঙ্গিনীর 'শ্যামা' নামকরণ করিলেন কেন? একটু প্রণিধান করিলেই উভয় ব্যাপারের কারণ বুঝা যায়।

শক্তির উপাসক কাপালিক যে কন্যাকে শৈশবাবধি পালন করিয়াছিলেন এবং শক্তিসাধনার উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিবার মানস করিয়াছিলেন, সে কন্যার নাম যে কালী করালীরই নামান্তর হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? এই নাম কাপালিকেরই প্রদত্ত এবং ইহা আমরা ক্রূরকর্ম্মা কাপালিকের কর্কশ কণ্ঠেই উচ্চারিত হইতে প্রথম শুনি [১ম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]। অধিকারী তাঁহাকে একবার আদর করিয়া 'মা কপালিনী' বলিয়াছেন [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ]। অধিকারী তাঁহাকে 'দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে মাতার অধিক স্নেহ করেন' [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ], তাই জগদম্বার নামে তাঁহাকে 'কপালিনী' বলিয়াছেন। শাস্ত্রেও আছে, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' অর্থাৎ জগতের সকল নারীই জগদম্বার অংশভূতা। (চণ্ডী, ১১শ অধ্যায়।)

বিবাহের পরে 'কপালকুণ্ডলা নামটি বিকট বলিয়া, গৃহস্থেরা তাঁহার নাম মৃন্ময়ী রাখিয়াছিলেন' [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]। এই নামটিরও

সার্থকতা আছে। গৃহবাসকালে তাঁহার চরিত্রে কতকটা পার্থিব ভাব আসিয়াছিল, 'তিনি কতকদূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন' [৪র্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ], 'যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে', 'বর্ণ সেইরূপ চন্দ্রার্দ্ধ-কৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশপ্রান্তে কোথা কাল মেঘ দেখা দিয়াছে।' [৪র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।] তাই তিনি তখন মৃন্ময়ী। আবার বহুদিন পরে যখন নবকুমার প্রেতভূমে দারুণ যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায়, তখন তাঁহাকে 'মৃন্ময়ী' বলিতে বলিতে একবার 'কপালকুণ্ডলে' বলিতে শুনি। তখন কপালকুণ্ডলার পূর্ব্বপ্রকৃতি সম্পূর্ণ-ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থান-কাল-পাত্রের সহিত এই সম্বোধনের কি সুন্দর সঙ্গতি!

কপালকুণ্ডলা নামের যেমন উপযোগিতা দেখা গেল, তাঁহার গার্হস্থ্য-জীবনের সঙ্গিনী স্নেহময়ী ননন্দাকে তাঁহার প্রিয় দেবতার নাম দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি সুন্দর কৌশলের, কলাভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। 'ভবানী-ভক্তিভাববিমোহিতা'র কর্ণে এই নাম যে বসন্ত, কমল, চাঁপা, ফুলমণি, সুন্দরী প্রভৃতি নাম অপেক্ষা শতগুণে মধুর!

'কপালকুণ্ডলা' ও 'মালতীমাধব'।

যদিও 'কপালকুণ্ডলা' নামটি শক্তির নামান্তররূপে হিন্দুর অপরিচিত নহে, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির 'মালতীমাধব' হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এই অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। উক্ত নাটকে 'ভীষণোজ্জ্বলা' কপালকুণ্ডলা কাপালিক অঘোরঘণ্টের শিষ্যা (প্রথম অঙ্কে উল্লিখিত, পঞ্চম অঙ্কে অঙ্কিত)। তিনি গুরুর তান্ত্রিক পূজায় বলিদানের জন্য কুমারী মালতীকে অপহরণ করিয়াছিলেন (পঞ্চম অঙ্ক) এবং পরে, মালতীর প্রণয়ী মাধব দুষ্ট কাপালিককে বধ করিয়া মালতীকে উদ্ধার

করিলে, গুরুবধের জন্য প্রতিহিংসা-পরায়ণা হইয়া পুনর্ব্বার মালতীকে অপহরণ করিয়াছিলেন (অষ্টম অঙ্ক)। শেষবার কামন্দকী-শিষ্যা সৌদামিনী মালতীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকার সহিত ভবভূতির নাটকের আখ্যানবস্তুর বিস্তর প্রভেদ। তথাপি এই বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভবভূতির নাটকে বলিদানার্থ অপহৃতা যুবতী মালতী, কপালকুণ্ডলা এই ক্রূরকর্ম্মে কাপালিকের সহযোগিনী, মাধব নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া প্রবল বিক্রমে মালতীকে তাহাদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকায় শক্তিসাধনায় ব্যবহরণীয়া যুবতীর নাম মালতী নহে—কপালকুণ্ডলা; নায়ক নায়িকাকে উদ্ধার করেন নাই, বরং নায়িকাই বলিদানার্থ ধৃত নায়ককে কৌশলে উদ্ধার করিয়াছেন। নাটকে দুষ্ট কাপালিক নায়ক-কর্ত্তৃক নিহত, আখ্যায়িকায় বলবান্ কাপালিকের নিকট নায়ক শিশুর ন্যায় বলহীন। আবার আখ্যায়িকার শেষ খণ্ডেও যখন কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে বলিদানের জন্য করায়ত্ত করিতে কৃতসংকল্প, তখনও নায়ক তাঁহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং কাপালিকের সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মালতী ও মাধবের প্রণয়ব্যাপারের সহিত বঙ্কিম-চন্দ্রের গ্রন্থোক্ত ব্যাপারের মিল নাই, কিন্তু ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, নাটকে ধর্ম্মব্রতা কামন্দকী ঘটকী, * আখ্যায়িকায় ধর্ম্মব্রত অধিকারী ঘটক।

যাহা হউক, উভয় বৃত্তান্তের এবং উভয় চরিত্রের উল্লিখিত-রূপ বৈষম্য-সত্ত্বেও কপালকুণ্ডলা নামটি 'মালতীমাধব' হইতে গৃহীত এ অনুমান অসঙ্গত নহে; উভয়ত্রই কপালকুণ্ডলা কাপালিক-শিষ্যা। তবে আখ্যায়িকায়

---

* কামন্দকী 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র কৌশিকীর অনুকরণ।

নায়িকার নাম মালতী * এবং তাঁহার ননন্দার নাম মদয়ন্তিকা † হইলে মূলানুযায়ী হইত, কিন্তু তদপেক্ষা কপালকুণ্ডলা ও শ্যামা নাম বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যের অধিকতর উপযোগী বলিয়াই এইরূপ নামকরণ, সে কথা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।

'মালতীমাধবে'র কথা যদি তুলিলাম, তবে আরও একটু আধটু সাদৃশ্যের কথা বলি। 'মালতীমাধবে' 'করালা' নামে চামুণ্ডা কাপালিক-পূজিতা (১ম অঙ্কে উল্লিখিত, ৫ম অঙ্কে বিবৃত); 'কপালকুণ্ডলা'য়ও 'মানবাকারপরিমিতা' করালকালী মূর্ত্তির উল্লেখ আছে [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ]। কিন্তু ইনি বনমধ্যে সংস্থাপিতা, অধিকারী ইঁহার পূজক; ভবভূতির 'করালা' শ্মশানে প্রতিষ্ঠিতা, কাপালিক তাঁহার সাধক, তিনি নরবলি গ্রহণ করেন। উভয় গ্রন্থেই শ্মশান আছে; কিন্তু নাটকে নায়ক শ্মশানে মহামাংস-বিক্রয়ার্থ অর্থাৎ আত্মবলিদানার্থ স্বেচ্ছায় আগত, আখ্যায়িকায় নায়ক বধার্থ বলপূর্ব্বক তথায় আনীত। 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম খণ্ডে কাপালিকের সাধনভূমি শ্মশান (৪র্থ ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ); আবার শেষ খণ্ডে (৯ম পরিচ্ছেদ) 'প্রেতভূমে' বা শ্মশানে কাপালিকের তান্ত্রিক পূজার আয়োজন। উভয়ত্রই ঘটনা রাত্রিকালে। 'মালতী-মাধবে'র শ্মশান-বর্ণনা-পাঠে বীভৎসরসের প্রভাবে শরীর কণ্টকিত হইয়া

---

* অবশ্য উভয়ের অবস্থাগত বা চরিত্রগত সাদৃশ্য নাই বলিলেও চলে। মালতীকে একস্থলে 'বরাকী তপস্বিনী' বলা হইয়াছে (পঞ্চম অঙ্ক); কিন্তু সেখানে 'তপস্বিনী' 'বরাকী'র সহিত সমার্থ, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা যে অর্থে তপস্বিনী, মালতী সে অর্থে তপস্বিনী নহেন। ['তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকিবি?' ২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]।

† মালতী রাজার অভিপ্রায়ানুরূপ নন্দনের পত্নী হইলে মদয়ন্তিকা তাঁহার ননন্দা হইতেন।

উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র শ্মশানবর্ণনায় বীভৎসরসের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু দেশকালপাত্রোচিত রুচি-বিবেচনায় পরিমিত-মাত্রায়। 'মালতী-মাধবে' শ্মশানের পার্শ্বে নদী (৭ম অঙ্ক), * 'কপালকুণ্ডলা'য় শ্মশানের পার্শ্বে গঙ্গা। 'মালতীমাধব' মিলনান্ত, সুতরাং শ্মশানদৃশ্য নাটকের মধ্যস্থলে; 'কপালকুণ্ডলা' বিয়োগান্ত, সুতরাং শ্মশানদৃশ্য 'আদাবন্তে চ'।

আর এক কথা। 'মালতীমাধবে'র ঘটনাস্থল পদ্মাবতী নগরী। এই নামস্মরণেই কি বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকায় নায়িকার প্রতিযোগিনীর পিতৃদত্ত নাম পদ্মাবতী হইয়াছে? অবশ্য এ নামও শ্যামার ন্যায় হিন্দু-দেবতার নাম। অতএব এ বিষয়ে ভবভূতির নিকট ঋণ অনেকে হয়ত কষ্টকল্পনা বিবেচনা করিবেন।

পরিবেষ্টনী ও দেশ-কাল-পাত্রের সঙ্গতি।

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, কবি কপালকুণ্ডলাকে প্রকৃতিদুহিতার আদর্শরূপে কল্পনা করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে দেখাইব, কপালকুণ্ডলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেষ্টনী (environment) কিরূপে উক্ত আদর্শের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেশ-কাল-পাত্রের এই সুসঙ্গতি কবির অপূর্ব্ব কলাকৌশলের পরিচায়ক। চিত্রকর যেমন তাঁহার মানসী মূর্ত্তি পটে প্রস্ফুট করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন না, মূর্ত্তির চতুঃপার্শ্বে তাহারই উপযোগী Setting অঙ্কিত করিয়া কেন্দ্রগতা মূর্ত্তি ও তাহার পরিবেষ্টনীর সুন্দর সামঞ্জস্য-বিধান করেন, কবিও এ ক্ষেত্রে সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। একটু নিবিষ্টচিত্তে গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এই সুসঙ্গতির সৌন্দর্য্য পাঠকের হৃদয়ে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে।

* এই সাদৃশ্যের উল্লেখে পাঠক শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে ফ্লুয়েলেন্‌-বর্ণিত ম্যাসিডন্‌ ও মনমাউথের সাদৃশ্য মনে করিয়া হাসিবেন, সন্দেহ নাই।

শৈশবাবধি কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির ভীমকান্ত-রূপদর্শনে অভ্যস্তা। 'অনন্ত-বিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল' কখনও প্রশান্তমূর্ত্তি, কখনও প্রচণ্ডমূর্ত্তি ; জনহীন নিবিড় অরণ্য একাধারে মনোহর ও ভয়াবহ। এতদুভয়ের প্রভাব আশৈশবসাহচর্য্যে তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার মনুষ্য-সঙ্গী অধিকারী ও কাপালিকের প্রভাব ও উপদেশ অপেক্ষাও ইহা তাঁহার চরিত্রের মজ্জাগত হইয়াছিল। যাক্, এক্ষণে চরিত্রগঠনের দিক্ ছাড়িয়া দিয়া পরিবেষ্টনীর উপযোগিতার উপলব্ধি করা যাউক।

আমরা (নবকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে) নায়িকাকে যখন প্রথম দেখি, তখন 'গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি।' কবি বুঝাইয়াছেন, 'সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।' [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।] স্থানকাল উভয়ই এই মূর্ত্তির অনুরূপ। রবীন্দ্রনাথ 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' * গায়িয়াছেন,—

"অয়ি সন্ধ্যে,
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,
কেশ এলাইয়া,
নত করি স্নেহময়, মোহময়, মুখ—"

আবার 'চিত্রা'য় 'শান্তিময়ী সন্ধ্যা'কে চিত্রিত করিয়াছেন,

"মৌন নভস্তল,

---

* আমরা পাঠক-সম্প্রদায়কে সমগ্র কবিতাটি পড়িতে অনুরোধ করি। রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যাগমে 'কত-না পুরান কথা, কত-না হারান গান' 'কতশত পুরান সাধের স্মৃতি'র জাগরণের কথা বলিয়াছেন। নবকুমারের হৃদয়েরও তৎকালে সেই অবস্থা। 'তখন তাঁহার হৃদয়ে কোন্ ভূতপূর্ব্ব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বলিবে ?' কালিদাসের "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্" ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।

ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল,
স্তম্ভিত, বিষাদে নম্র; নির্ব্বাক্ নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী—"

কপালকুণ্ডলা যেন সেই সন্ধ্যারই মূর্ত্ত আবির্ভাব। তাঁহার দেহ সন্ধ্যারই মত 'নিরাভরণ'। তাঁহার 'অবেণী-সম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুলফ-লম্বিত কেশভার।...অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না।...কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য।' প্রকৃতই যেন সন্ধ্যা 'কেশ এলাইয়া' 'নত করি স্নেহময় মোহময় মুখ।'* (তাঁহার 'স্নেহময়' স্বভাবের পরিচয় নবকুমারের প্রতি তাঁহার প্রশ্নে পাওয়া যাইবে।) বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন, সন্ধ্যাকালই এই মূর্ত্তিদর্শনের প্রকৃষ্ট কাল। এই 'নিরুপম জ্যোতির্ম্ময়ী মাধুরী-মূরতি' † রাকাশশিশোভনা গতঘনা শারদ-রজনীতে দেখিলে মানাইত না, বালার্কসিন্দূরফোঁটারঞ্জিত ঊষায় দেখিলে মানাইত না, মার্কণ্ডময়ূখমালালোকিত মধ্যাহ্নে দেখিলে মানাইত না।

আর 'সমুদ্রের জনহীন তীরে' যখন 'প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল', রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি, দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগন-কোণে' § তখন সেই 'দৈবী মূর্ত্তি'র

* এই 'ঘনকৃষ্ণ চিকুরজালে' তাঁহার সন্ধ্যার সহিত সাদৃশ্য, দেহসৌন্দর্য্যে নহে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা স্মর্ত্তব্য—

Like twilight's too her dusky hair.
But all things else about her drawn
From Maytime and the cheerful dawn.

† রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'—নিভৃত আশ্রম।

§ 'সোণার তরী'—নিরুদ্দেশ যাত্রা।

করুণার্দ্র কণ্ঠস্বর কি মধুর! 'সাগর-বসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।' এতটা মাধুর্য্য, এতটা সৌন্দর্য্য, এতটা গাম্ভীর্য্য, এতটা ভাবসমন্বয়, এতটা দেশ-কাল-পাত্রের সুসঙ্গতি, এতটা পরিবেষ্টনীর সামঞ্জস্য, ফার্ডিন্যাণ্ডের সহিত মির‍্যাণ্ডার প্রথম-সম্ভাষণে আছে কি?

আবার পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যখন আমরা (নবকুমারের সঙ্গে-সঙ্গে) নায়িকার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ পাই, যখন নবকুমার পরদিন কাপালিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিকতাময় সমুদ্রতীরে বধার্থ নীত হইতেছেন, এবং সেই 'আগুল্‌ফলম্বিত নিবিড় কেশরাশিধারিণী বন্য দেবীমূর্ত্তি'র আবার আবির্ভাব, 'তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই'। পরে বধ্যভূমিতে যখন তিনি নবকুমারের উদ্ধারার্থ আবির্ভূতা, তখন রাত্রি, অমাবস্যার ঘোরান্ধকারা যামিনী। যখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে অধিকারীর আশ্রয়ে আনিলেন, তখন 'রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।' [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।]

তাহার পর বিবাহ—তাহাও 'গোধূলি-লগ্নে' সম্পন্ন হইল। [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।] পরে পতিগৃহে যাত্রা 'প্রত্যূষে।' সর্ব্বত্র কপাল-কুণ্ডলার প্রকৃতির সহিত গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাকালের সুন্দর সঙ্গতি।

(দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভে) আশৈশব-পরিচিত সমুদ্রকূল হইতে অপরি-চিত পতিগৃহে যাইবার পথে 'পান্থনিবাসে' মতিবিবি যখন তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, তখনও রাত্রি-কাল। 'কপালকুণ্ডলা দোকানঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র,—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল।' [২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।] এ ক্ষেত্রেও প্রকৃতিদুহিতার অসামান্য সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনের ইহাই উপযুক্ত স্থান-কাল। স্থান-কালের বিরোধি-তাতেই (contrast) তাঁহার সৌন্দর্য্যের সার্থকতা।

তাহার পর, বিজনবাসিনী প্রকৃতি-দুহিতা যখন লোকালয়ে আনীতা ও 'অবরোধে' রক্ষিতা, তখনও তাঁহার পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। স্বচ্ছন্দবনবিহারিণী নিবিড় অরণ্যপ্রদেশ ও বিস্তৃত সাগরসৈকত-ভূমি হইতে একেবারে রবীন্দ্রনাথের ['মানসী' কাব্যে বর্ণিত] 'বধূ'র ন্যায় 'পাষাণকায়া রাজধানী'তে নীতা হন নাই।* 'বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া'—রবীন্দ্রনাথের এই কথা কপাল-কুণ্ডলা সম্বন্ধে খাটে না। 'সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না। রাজপথসকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।...অনেক দূরে ভাগীরথী।' [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] ইহা 'মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে, সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' না হইলেও এখানে 'খোলা মাঠ, উদার পথঘাট, পাখীর গান, বনের ছায়া, জলরেখা প্রভৃতি উন্মুক্ত প্রকৃতির সুন্দর উপাদানের সম্পূর্ণ অভাব নাই। ইহা যেন ক্ষুদ্রাকারে কপালকুণ্ডলার পূর্ব্ববাসস্থানেরই প্রতিরূপ। যখন তিনি 'কতকদূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না', তখনও তিনি 'নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন।' [৪র্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।] তিনি শ্যামার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, 'বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।' বুঝা গেল, তাঁহার পূর্ব্বপ্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

---

* টেনিসনের The Lord of Burleigh'র পল্লীপালিতা বধূও এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।

তাঁহার পূর্ব্ববাসভূমিতে অধিকারী ও কাপালিক ভিন্ন তাঁহার অন্য সঙ্গী ছিল না। এখানেও স্বামী ও শ্যামা তাঁহার সঙ্গী ও সঙ্গিনী। প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, মনুষ্যসংস্পর্শ যথাসম্ভব কমাইবার জন্য কবি গৃহের অন্যান্য পরিজনকে backgroundএ রাখিয়াছেন।

'অবরোধে' আমরা যখন তাঁহাকে প্রথম দেখি, তখন তিনি ছাদের উপর, প্রকোষ্ঠে নহে। অর্থাৎ স্থান উন্মুক্ত আকাশতলে—'ছাদের পরে বসি।' হৃদয় 'দেয়ালে পেয়ে বাধা' গুমরিয়া উঠে না। সঙ্গিনী একমাত্র শ্যামা। সঙ্গিনীর নামটিও কপালকুণ্ডলার প্রকৃতির সহিত কিরূপ সুরবাঁধা, তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। তখনও 'সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। ...অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।' [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] স্থান, কাল ও সাহচর্য্য সকলই কেমন সুসঙ্গত! এখনও কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বের মতই 'অবিন্যস্ত কেশভারমধ্যে প্রায় অর্দ্ধলুক্কায়িতা।' শ্যামাসুন্দরী সাধ করিয়া 'চুলের রাশি' বাঁধিয়া দিতে চাহিলেও কপালকুণ্ডলা বাঁধিতে চাহেন না। তাঁহার প্রকৃতি ঠিক পূর্ব্বের মতই 'বন্য', তিনি এখনও 'যোগিনী'।

ইহার অনেক দিন পরে, চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে, আমরা আবার তাঁহার দেখা পাই। এখন 'যোগিনী গৃহিণী হইয়াছেন,' 'কতক-দূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না' হইয়াছেন, এখন আর তিনি 'আলুলায়িত-কুন্তলা ভূষণহীনা' নহেন। 'সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল, ভুজঙ্গের বৃহত্তুল্য, আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীবদ্ধ হইয়াছে। দুই কর্ণে হেমকর্ণভূষা দুলিতেছে, কণ্ঠে হিরণ্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে।' 'বর্ণ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশপ্রান্তে কোথা কালমেঘ দেখা দিয়াছে।' তিনি এখন ছাদে নহেন, 'শয়নকক্ষে।' এ সকলই তাঁহার

প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের সূচক। কিন্তু এবারেও আমরা 'প্রদোষ-কালে'ই তাঁহার দেখা পাই, পার্শ্বে একমাত্র সঙ্গিনী শ্যামাসুন্দরী। এখনও তিনি 'রাত্রে বনে বনে বেড়ান'র প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন—তবে এবার নিজের সুখের জন্য নহে, স্নেহশীলা ও স্নেহপাত্রী ননন্দার উপকারের জন্য।

যখন তাঁহাকে বনে ওষধি খুঁজিবার জন্য বহির্গত হইতে দেখি, তখনও রাত্রিকাল, কিন্তু 'নিশা সজ্যোৎস্না' [৪র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।] 'যামিনী মধুরা।……মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র।' [৪র্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ] ইহা পূর্ব্বের সকল বর্ণনা হইতে বিভিন্ন। কিন্তু এখানে কবির কলাকৌশল বিচিত্র। দীপ নিবিবার আগে যেমন একবার জ্বলিয়া উঠে, ঘোরতমিস্রা কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টগগন আচ্ছন্ন করিবার পূর্ব্বেও একবার আকাশে চন্দ্র হাসিল, 'মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু মন্দ' বহিল; আর 'সম্ভুক্ত পূর্ব্ব-সুখের অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।' অতীত ও বর্ত্তমান সুখের সহিত ভবিষ্যৎ বিপদের (contrast) বিরোধিতার গুণে চিত্র সুন্দররূপে ফুটিয়াছে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে 'কপালকুণ্ডলার পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল। বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগরবারিবিন্দুসংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার লম্বালক-মধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল; অমল নীলানন্ত গগনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন; সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বস্মৃতি-সমালোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিলেন।' আবার বহুদিন পরে কপালকুণ্ডলার কাপালিক-দর্শন ঘটিবে; তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই কবি সুকৌশলে পূর্ব্বস্মৃতি, পূর্ব্বাবস্থা, পূর্ব্বের atmosphere ফিরাইয়া আনিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা নামও এখানে সুপ্রযুক্ত। কপাল-কুণ্ডলার মনের সহিত পাঠকের মনও কাপালিক-দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। (নিবিড় বনমধ্যে হোমাগ্নি ও 'অনবরত সমানোচ্চারিত'

মন্ত্রপাঠ তৃতীয়খণ্ডের শেষভাগে পাঠকের মনকে কাপালিক-দর্শনের জন্য একটু পূর্ব্বহইতেই প্রস্তুত করিয়াছে।)

তাহার পর যখন কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যৎ বিপদ্ ঘনাইয়া আসিল, তখন 'আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল; কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। আকাশ নীলকাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল।...প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণ রবে প্রঘোষিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।' নায়িকার অদৃষ্ট-আকাশের অবস্থার সহিত প্রকৃতির এই রুদ্র মূর্ত্তির কি চমৎকার সঙ্গতি! কি সুন্দর Symbolism! কেন না তখন কপালকুণ্ডলার হৃদয়-সমুদ্রেও প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু বহিতেছে। 'যে মেঘে অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার জীবনযাত্রা গাহমান' * হইবে, ইহা যেন তাহারই বহিঃপ্রকাশ।

পরক্ষণেই ঘোরান্ধকারে 'একবার বিদ্যুৎ চমকিল,' কপালকুণ্ডলা সেই ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলোকে দেখিলেন, মূর্ত্তিমান্ কালাশনি-সদৃশ 'কাপালিক।'

নিয়তির্বিধায় প্রথমং সুখমুপরি দারুণং দুঃখম্।
কৃত্বালোকং তরলা তড়িদিব বজ্রং নিপাতয়তি॥

পরপরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শন। সেক্ষেত্রেও কালের সুন্দর সঙ্গতি, ঊষার অস্পষ্ট আলোকে। নিদ্রাভঙ্গে প্রভাতে 'বসন্তবায়ুস্রোতঃ'—কিন্তু ইহাও পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর মন্দবায়ুর ন্যায় (contrast) বিরোধিতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

* উদ্ধৃত অংশটুকু 'কপালকুণ্ডলা'র অধুনা-পরিত্যক্ত 'গ্রন্থখণ্ডারম্ভে'-নামক পরিচ্ছেদ হইতে গৃহীত।

এক্ষণে কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বস্মৃতিতে তন্ময়। এক রাত্রিতেই তাঁহার 'গৃহরমণীর স্বভাব' পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার 'নৈশভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসি-পালিতা ভবানীভক্তিভাববিমোহিতা'র প্রকৃতি প্রত্যাবৃত্ত হইল। বিশেষতঃ পররাত্রিতে লুৎফউন্নিসার সহিত কথাবার্ত্তার পরে তাঁহার 'একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল।'

দ্বিতীয় রাত্রিতে বনভ্রমণকালে 'কপালকুণ্ডলা অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন।' [৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] এই শেষের রাত্রিতে 'নবকুমার দেখিলেন কপালকুণ্ডলা আলুলায়িতকুন্তলা। যখন কপালকুণ্ডলা তাঁহার হয় নাই, তখনই সে কুন্তল বাঁধিত না।' [৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।] এখন আর যেন সে তাঁহার নাই। এখন কপালকুণ্ডলা সম্পূর্ণভাবে 'অন্তঃকরণসম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান', এখন সে ভৈরবীর চরণে জীবন-সমর্পণে দৃঢ়সঙ্কল্পা, 'অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনাবাক্য-ব্যয়ে' কাপালিকের আজ্ঞাপালনে তৎপরা। তাই কপালকুণ্ডলা আজি এলোকেশী মায়ের এলোকেশী মেয়ে। সেই করালমূর্ত্তি কাপালিক, সেই গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী রণরঙ্গিণী ভৈরবী, সেই ঘোরা তিমিরা রজনী, সমস্তই কপালকুণ্ডলার এখনকার অবস্থার সঙ্গে সুরবাঁধা। তাই হিজলীর জঙ্গলে যেমন কাপালিক 'মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনি'তে ডাকিয়াছিলেন, "কপাল-কুণ্ডলে," নবকুমারও তেমনি 'ভীমনাদে ডাকিলেন, "কপালকুণ্ডলে!"... ইদানীন্তন কেহ তাঁহাকে কপালকুণ্ডলা বলিয়া ডাকিত না।' [৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।]

বনভ্রমণ, পুরুষবেশীর সহিত কথোপকথন, সমস্তই 'রজনীযোগে'। এক্ষেত্রেও ঘটনাকাল লক্ষণীয়।

তাহার পরে শেষদৃশ্য 'প্রেতভূমে।' একদিন কপালকুণ্ডলা নৃশংস কাপালিকহস্তে নিগৃহীত নবকুমারের বলিদান নিবারণ করিতে বধ্যভূমিতে

গিয়াছিলেন। আজ আবার কাপালিক বধ্যভূমিতে বলিদানে উদ্‌যোগী; নবকুমার তাঁহার সহায়, কপালকুণ্ডলা বলি। 'The wheel has come full circle.' 'নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।' কি অদ্ভুত ভাগ্য-বিপর্য্যয়! অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! অথচ উভয় চিত্রে কি আশ্চর্য্য মিল! সেথানে সমুদ্রতটে বালিয়াড়ি, এথানে 'গঙ্গাতীরে একখণ্ড বৃহৎ সিকতাময় স্থান'; সেথানেও 'গম্ভীর জলকল্লোল', 'সাগরগর্জ্জন'। 'নীল-জলমণ্ডলমধ্যে সফেন তরঙ্গভঙ্গ' [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ]; এথানেও 'তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকলরব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল।' [৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।] উভয়ত্রই ঘটনাকাল 'রাক্ষসী সেই তিমির রজনী।' গ্রন্থের আদি ও অন্ত কেমন সমসূত্রে গ্রথিত, সমরেথায় মিলিত, সমবর্ণে চিত্রিত, সমভাবে ভাবিত!

'অবিরত বায়ুতাড়িত তরঙ্গাভিঘাতে উপকূলতল ক্ষয়িত হইয়াছিল; কথনও কথনও মৃত্তিকাথণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া যাইত।' স্থানের এই প্রকৃতি ও কপালকুণ্ডলার আসন্ন বিপদের কি সুন্দর সঙ্গতি! 'চন্দ্রমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল।...পূজাস্থানে দীপ নাই—কাষ্ঠথণ্ডমাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেথাইতেছিল'।* ইত্যাদি শ্মশানদৃশ্য কপাল-কুণ্ডলার তৎকালীন অবস্থার ও শেষ পরিণামের সহিত একই 'অশ্রু-সজল' ভৈরবী রাগিণীতে সুরবাঁধা। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় 'কপালকুণ্ডলা'র কবিও বলিতে পারেন—"ভৈরবী দিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া রচিব নিরাশা-কাহিনী।" † উভয়ত্র যে সুন্দর সঙ্কেত (Symbolism) রহিয়াছে,

---

* But rather darkness visible
Served only to discover sights of woe.—*Paradise Lost* : Bk I.

† 'মানসী'—ভৈরবী গান।

তাহাও কাব্য-কলা-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। 'চৈত্রবায়ু-তাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল, অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলার সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।' [৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।] যিনি 'বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা তৎকালে সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন' [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ], তিনি যৌবনে দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক কর্তৃক নির্য্যাতিতা হইয়া নদীপ্রবাহমধ্যে বিলীন হইলেন। আবির্ভাব ও তিরোভাবে কি সুন্দর সঙ্গতি ও কি গভীর সঙ্কেত (Symbolism)!

From the great deep to the great deep *she* goes.

নিমিত্ত (omens) ও সঙ্কেত (Symbolism)।

গ্রন্থে কয়েক স্থলে অলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে—সেগুলি নিমিত্ত (omen) সূচিত করে। সকল দেশের কবিই এই শ্রেণীর অলৌকিক ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছেন; সকল সমাজেই এইরূপ অলৌকিকে বিশ্বাস অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলিত। সাহিত্য সমাজের ছায়া, সুতরাং ইহা সাহিত্যে স্থানলাভ করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। সভ্যতার প্রভাবে এরূপ বিশ্বাস মানবমনে ক্রমশঃ শিথিলমূল হইলেও, কাব্যকলায় ইহার সবিশেষ উপযোগিতা ও উপাদেয়তা আছে। (Symbolism) সঙ্কেত-হিসাবেও ইহার মূল্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বহুস্থলে এই শ্রেণীর ব্যাপার তাঁহার কাব্যকলার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এস্থলে তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ এইমাত্র বলিব যে, এই গ্রন্থে সংঘটিত নিমিত্ত-পরম্পরার সহিত কপালকুণ্ডলার চরিত্রের যেরূপ সঙ্গতি ও সম্পর্ক আছে, এরূপ তাঁহার আর কোন গ্রন্থে নাই। কেন না কপাল-

কুণ্ডলা কাপালিক ও অধিকারীর নিকট ধর্ম্ম-শিক্ষা লাভ করাতে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির যে একটি বিশিষ্ট ঝোঁক (bias) হইয়াছিল, এই শ্রেণীর সংস্কার তাহার সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বদ্ধ। একথা কপালকুণ্ডলার চরিত্রবিশ্লেষণ-প্রসঙ্গেও তুলিতে হইবে। আপাততঃ যথাক্রমে নিমিত্ত (omen) গুলির নির্দ্দেশ করিতেছি।

(১) ভবানীর চরণে দুইবার ত্রিপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকারিপ্রদত্ত ত্রিপত্র গৃহীত হইয়াছিল [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ], অতএব যে মানস করিয়া অর্ঘ্য প্রদত্ত হইয়াছিল 'তাহাতে অবশ্য মঙ্গল।' পক্ষান্তরে, স্বামীর সঙ্গে যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা যে ত্রিপত্র ভবানীর চরণে স্থাপিত করিলেন, তাহা 'পড়িয়া গেল'। [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।] এটি দুর্লক্ষণ। উভয় ঘটনাই নব্যশিক্ষাগর্ব্বিত পাঠকগণ হয় ত কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু শাক্তবংশে জন্মিয়া আমরা এগুলি ঠিক অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারি না। যাহা হউক, আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি ব্যাপার পরস্পরবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু, কাপালিক 'ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া' কপাল-কুণ্ডলাসম্বন্ধে যে দুষ্ট অভিপ্রায় পোষণ করিতেছিল তাহা বিফল হইবে, 'তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ' তাহা স্থাপিত হইবে না, পরন্তু কপালকুণ্ডলা হিন্দুকুমারীর অবশ্যকরণীয় বিবাহ-সংস্কার-লাভে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহাই দেবীর অধিকারিপ্রদত্ত ত্রিপত্র-গ্রহণ দ্বারা সূচিত। পক্ষা-ন্তরে, কপালকুণ্ডলা স্বামীর সংসারে সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্যপালনে কৃতকার্য্য হইবেন না, পরিণয়ে প্রণয়সুখ ঘটিবে না, তাঁহার বিবাহিত জীবনের বিষাদময় অবসান হইবে,—ইহাই দেবীর কপালকুণ্ডলা-প্রদত্ত ত্রিপত্র-প্রত্যাখ্যান দ্বারা সূচিত। 'যদি কর্ম্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র গ্রহণ করিতেন ; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত।' [২য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] কপালকুণ্ডলার এ বিশ্বাসে

শাক্ত হিন্দুমাত্রেই সায় দিবেন। * কপালকুণ্ডলার ধর্ম্মভাবের সহিত এই বিশ্বাসের কার্য্যকারণসম্বন্ধও সুসঙ্গত।

(২) এই ত্রিপত্র-চ্যুতিতে ভীত হইয়া যখন কপালকুণ্ডলা অধিকারীকে সংবাদ দিলেন, তখন অধিকারী উপদেশ দিলেন:—'এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে।' [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।] আমরা ভবিষ্যতে অধিকারীর এই উপদেশ ফলিতে দেখিব। [৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।] এই উক্তিও যেন একটা দুর্লক্ষণ। ইহার অন্তর্নিহিত Irony ও সুন্দর।

(৩) ৪র্থ খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে বর্ণিত কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন নিমিত্ত-সূচক। ইহার Symbolism ও সুন্দর। (এক্ষেত্রে ডন জুয়ানে বর্ণিত হেইডীর আকস্মিক হৃৎকম্প ও স্বপ্ন স্মর্ত্তব্য।) ইহা কপালকুণ্ডলার পূর্ব্ববৃত্তান্ত-আলোচনায় আলোড়িত উত্তেজিত মস্তিষ্কের ক্রিয়া বলিলেই এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। স্বপ্নে দেবতারা মানুষকে সতর্ক করিয়া দেন, বিপদের সূচনা জ্ঞাপন করেন, বিপন্নিবারণের উপায় বিধান করেন, এরূপ বিশ্বাস শুধু হিন্দুর কেন, জগতের বহু জাতির মধ্যে আছে। নানা ভাষার কাব্যেও এইরূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে মানবের সহিত প্রকৃতির সূক্ষ্ম সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাই বোধ হয় প্রকৃত তত্ত্ব। † স্বপ্ন 'অমূলক চিন্তামাত্র' অথবা 'আনন্দমঠে'র মহেন্দ্রসিংহের ন্যায় 'স্বপ্ন বিভীষিকামাত্র' বলিয়া উড়াইয়া দিলে

---

* টেনিসনের এনক আর্ডেনে নায়িকা এনির বাইবেল খুলিয়া ভাগ্যপরীক্ষা এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।

† 'Signs, for aught I know, may be but the sympathies of Nature with man.'—*Jane Eyre*, ch 21. এই নভেলখানিতে নায়িকার কয়েকটি স্বপ্ন বর্ণিত। 'In visions and dreams we are passive, and our souls

চলিবে না। অন্ততঃ কাব্যকলার দিক্ হইতে দেখিতে হইলে Coming events cast their shadows before এইরূপ জ্ঞানে স্বপ্নবিচার করিতে হইবে। স্বপ্নের এই সকারণত্ব বুঝাইবার জন্যই গ্রন্থকার পরিচ্ছেদশীর্ষে বায়রনের 'I had a dream, which was not all a dream' এই ছত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই স্বপ্নদর্শন ও স্বপ্নে বিশ্বাস, পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিশ্বাসের ন্যায়, কপালকুণ্ডলার দেবশক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ চরিত্রেরই অঙ্গ, অতএব এ ক্ষেত্রে ইহা সুসঙ্গত হইয়াছে। *

৪র্থ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাপালিকের স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণিত। ইহা নবকুমারকে ও লুৎফউন্নিসাকে ঠকাইবার জন্য ভণ্ডতপস্বীর বুজরুকি বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। এরূপ স্বপ্ন ঘোর তান্ত্রিক সাধক কাপালিকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ইহা তাহার চরিত্রের সহিত সুসঙ্গত। এই পরিচ্ছেদের শীর্ষে উদ্ধৃত "তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্" চরণটি কাপালিকের চরিত্রের দিক্ হইতে সুপ্রযুক্ত।

আবার পুরুষবেশীর মুখে কাপালিকের ঐ স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া কপালকুণ্ডলা 'শিহরিয়া উঠিলেন, চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন' [৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ] এবং স্বপ্নবিচার করিয়া ভবানীর তুষ্টির জন্য 'আত্মবিসর্জ্জনে

---

are as an instrument in the Divine hand'—*Romola*, ch 15. এই নভেলখানিতেও নায়িকা রোমোলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নায়িকার ভ্রাতার একটি স্বপ্ন বর্ণিত। তাহার সঙ্কেত (Symbolism) মর্ম্মস্পর্শী।

* কপালকুণ্ডলা-চরিত্রে ও 'আনন্দমঠে' বর্ণিত কল্যাণী-চরিত্রে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু কল্যাণীর স্বপ্নদর্শন ও স্বপ্নে বিশ্বাস করিয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প, আবার সেই সঙ্কল্পচ্যুতির জন্য কন্যার অপমৃত্যু ঘটিল এই বিশ্বাস—কপালকুণ্ডলার গভীর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুরূপ। [আনন্দমঠ, ১ম খণ্ড ২২শ পরিচ্ছেদ।] ইহা হিন্দুনারী-প্রকৃতির মজ্জাগত।

প্রস্তুত হইলেন' [৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ]—এ সকলই তাঁহার 'ভবানী-ভক্তিভাববিমোহিতা' প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত।

(৪) ৪র্থ খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া ভৈরবী-মূর্ত্তি দেখিলেন ; 'বৎসে, আমি পথ দেখাইতেছি' এই শব্দ তৎসঙ্গে 'তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।' গ্রন্থকার এই অলৌকিক ব্যাপার-সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—'যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্যসৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।' ইহা হইতে বুঝা যায়, গ্রন্থকার মনস্তত্ত্ববিদের প্রণালীতে ব্যাপারটাকে (hallucination) 'ভ্রান্তি' বলিতে চাহেন। * কিন্তু পরিচ্ছেদ-শীর্ষে উদ্ধৃত 'No Spectre greets me—no vain shadow this,'—এই ছত্রে গ্রন্থকারের মতসম্বন্ধে অন্যরূপ প্রতীতি হয়। যাহা হউক, 'ভ্রান্তি' বলিয়া বিবেচনা করিলে যদিও ইহাকে একটি নিমিত্ত (omen) বলা যায় না, কিন্তু তথাপি ইহা কপালকুণ্ডলার প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত।

---

* এ হিসাবে দেখিলে ম্যাক্‌বেথের (dagger) পরওদর্শন ও 'আর ঘুমাও না' (sleep no more) ইত্যাদি বাক্যশ্রবণ ইহার সহিত তুলনীয়। বিখ্যাত আখ্যায়িকাকার স্কটও বহুস্থলে এই সকল অলৌকিক ব্যাপারকে ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে বা যুক্তিমূলক কারণ দর্শাইতে (rationalisation) চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা স্কটের আধুনিক শিক্ষার পরিচায়ক। তথাপি আইভ্যানহোর এই বাক্যগুলি প্রণিধানযোগ্য। "Have you never felt an apprehension of approaching evil for which you in vain attempted to assign a cause? Have you never found your mind darkened like the sunny landscape, by the sudden cloud which augurs a coming tempest? And thinkest thou not that such impulses are deserving of attention, as being the hints of our guardian spirits, that danger is impending?" *Ivanhoe*, ch 40.

এই পর্য্যন্ত স্থূলস্থূল কয়েকটি নিমিত্তের উল্লেখ করিলাম, সে গুলির সুসঙ্গতির আলোচনা করিলাম এবং Symbolismএর দিক্‌ও দেখাইলাম। এক্ষণে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত Symbolismএর কয়েকটি সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব।

(১) কপালকুণ্ডলা যখন ব্রাহ্মণবেশীর সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিবেন সিদ্ধান্ত করিলেন, তৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—'জ্বলন্ত বহ্নি-শিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।' [৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] এই 'পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ,' এই

'যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥

তত্ত্বেও (omen) নিমিত্তের আভাস পাওয়া যায়। কেন না এই 'সিদ্ধান্ত' হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ বিপদের সূত্রপাত। ইহার সূচিত Symbolism সুন্দর।

(২) এই চক্ষে দেখিলে, নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে ; দেখিয়া কপালকুণ্ডলা 'ধীরে ধীরে সেই দীপ-জ্যোতির অভিমুখে গেলেন' [৪র্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ]—এই পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাপারটি যেন 'যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গাঃ' ইত্যাদি নিয়তির বাস্তবমূর্ত্তি। ইহারও Symbolism সুন্দর।

(৩) আবার প্রথম রাত্রির ঘটনার পরে কপালকুণ্ডলা যখন গৃহাভিমুখে চলিলেন, 'তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল ; কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল।...মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। আকাশ নীলকাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল।......প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘ-শব্দ এবং অশনিপাত-শব্দ হইতে লাগিল। ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল।'

[৪র্থ খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।] এই আকস্মিক প্রকৃতিবিপর্য্যয় একটা দুর্নিমিত্ত। আবার ইহার, বিশেষতঃ, নিম্নেরেথ অংশটির Symbolism প্রণিধানযোগ্য।* কপালকুণ্ডলার অদৃষ্ট-আকাশও ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, প্রচণ্ড ঝটিকার সৃষ্টি হইল। আর বিদ্যুতের আলোকে পরিদৃষ্ট কাপালিক যেন মূর্ত্তিমান্ কালাশনি।

(৪) ব্রাহ্মণবেশীর সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিতে যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা 'শয়নাগারে প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া দিলেন।' কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, 'তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল।' ইহাও একটি দুর্লক্ষণ। [৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] এই যাত্রার পরিণামে তাঁহার জীবনদীপও নিবিবে। এই সকল স্থলের Symbolism অতি সুন্দর কলাকৌশলের পরিচায়ক।

* ইংরেজী বহু কাব্যে ইহার উদাহরণ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, টেনিসনের এনক আর্ডেনে এনকের প্রত্যাবর্ত্তনের দিনে আকাশের অবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ সমালোচকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি। "The novelist may treat the natural background and accessories of his action in various ways... He may associate them directly with his drama either through contrast or through sympathy...Of these two methods, that of making external conditions harmonise with the action or the mood of the characters is the more common. The use of nature in sympathy with man is indeed the most familiar of dramatic devices ; and the connection is often accentuated to the full and most elaborately worked out ; as in the many storms which, as every novel-reader will remember, synchronise with and intensify situations of tragic power...In the sympathetic use of natural background nature often becomes almost symbolical."—*Hudson* :—*An Introduction to the Study of Literature.* pp. 214-15.

(৫) আবার যখন কপালকুণ্ডলা ভৈরবী-প্রেরিত স্বপ্নাদেশে 'আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত', ভৈরবীর মূর্ত্তি তাঁহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাত, ভৈরবীর বাণী তাঁহার কর্ণকুহরে ধ্বনিত, তখন নবকুমার ও কাপালিককে 'যমদূত' বলিয়া ভ্রান্তি তাঁহার তদানীন্তন মনের অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। [৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।] আবার ইহার Symbolismও মর্ম্মস্পর্শী। কেন না, বাস্তবিকই তখন উভয়ে তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

(৬) শেষ দৃশ্যে 'প্রেতভূমে' 'চন্দ্রমা অস্তমিত হইল, বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল।' [৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ] এক্ষেত্রেও Symbolism সুন্দর, বহিঃপ্রকৃতি ও নায়িকার ভাগ্যের সঙ্গতি চমৎকার।

পূর্ব্ববর্ণিত দুর্নিমিত্তগুলি বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারিলে উত্তম। কিন্তু যাঁহারা আধুনিক শিক্ষার ফলে এরূপ অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস হারাইয়াছেন, তাঁহারাও কলাকৌশলের দিক্ হইতে সমস্ত পরিলক্ষণ করিলে এগুলির উপযোগিতা (appropriateness) ও Symbolismএ মুগ্ধ হইবেন, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে অলৌকিকে অনাস্থাবান্ ইংরেজী-শিক্ষিত পাঠককে মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ারের বাক্যগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি :—

"There are more things in Heaven and Earth than are dreamt of in your philosophy." "They say miracles are past; and we have our philosophic persons, to make modern and familiar, things supernatural and causeless. Hence it is that we make trifles of terrors, ensconcing ourselves into seeming knowledge, when we should submit ourselves to an unknown fear."

তৃতীয় অধ্যায়।

গল্পের গঠন (Structure of the story)।

দুইটি স্বতন্ত্র আখ্যান গ্রন্থে বিবৃত। প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বিকাশ মুখ্য আখ্যানবস্তু। গ্রন্থের ১ম, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড প্রায় সমস্তই প্রধান আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলার সহিত (contrast) বিরোধিতা-প্রদর্শনের জন্য বিলাসের ক্রোড়ে লালিতা ও ভোগসুখের জন্য লালায়িতা পদ্মাবতীর চরিত্রের বিকাশ গৌণ আখ্যানবস্তু। সমগ্র ৩য় খণ্ডে ও অন্যান্য খণ্ডের কোন কোন অংশে এই অপ্রধান বৃত্তান্ত বর্ণিত। উভয় চরিত্রের বিরোধিতা দুই প্রকারের। (১) কপালকুণ্ডলার পবিত্রতা এবং পদ্মাবতীর অপবিত্রতা; (২) কপালকুণ্ডলার চরিত্রে পতিপ্রেমের ও সংসারাসক্তির অভাব এবং পদ্মাবতীর নূতন জীবনে পতিপ্রেমের তীব্রতা ও স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। নায়ক নবকুমার উভয় আখ্যানের সংযোগী পুরুষ, উভয় নায়িকার ভাগ্যসূত্র তাঁহার হস্তে। প্রধান আখ্যানে নবকুমার নায়ক (protagonist); প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলেও কাপালিককে প্রতিনায়ক (antagonist) বলা যায়, কেন না নায়িকার ভাগ্যের উপর তাঁহারা পরস্পরের বিপরীত শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন; অধিকারী ও শ্যামা নায়কের সহায়, পদ্মাবতী শেষদিকে প্রতিনায়কের কতকটা সহায়। অপ্রধান আখ্যানেও নবকুমার নায়ক (protagonist), সেলিম প্রতিনায়ক (antagonist)। দুইটী আখ্যান একত্র করিয়া দেখিলে কপালকুণ্ডলা নায়িকা, প্রতিদ্বন্দ্বিনী পদ্মাবতী প্রতিনায়িকা।

আখ্যান দুইটী স্বতন্ত্র হইলেও সুকৌশলে গ্রন্থিবদ্ধ; **চতুর্থ** খণ্ডে এই গ্রন্থিবন্ধন সুস্পষ্ট, কিন্তু **দ্বিতীয়** খণ্ডের প্রথম তিনটী পরিচ্ছেদে তাহার সূত্রপাত। **প্রথম** খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে নবকুমারের পূর্ব্ব-ইতিহাস-বর্ণনাপ্রসঙ্গে পদ্মাবতীর পূর্ব্ব ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস আছে। **চতুর্থ** খণ্ডে আখ্যানদ্বয় গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া মিলিত হইয়াছে শুধু তাহা নহে, অপ্রধান আখ্যানের নায়িকা প্রধান আখ্যানের নায়িকার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সহায়তা করিয়াছেন।

প্রধান আখ্যানের নায়িকার বৃত্তান্তবর্ণন ও চরিত্রবিকাশের জন্য কতকগুলি পাত্রপাত্রীর সমাবেশ করিতে হইয়াছে; যথা কাপালিক, অধিকারী, নবকুমার, মতিবিবি (অর্থাৎ পদ্মাবতী), ভিক্ষুক, শ্যামা; (শাশুড়ী, বড় ননদ ও নন্দাইএর উল্লেখমাত্র আছে)। অপ্রধান আখ্যানের নায়িকার বৃত্তান্তবর্ণন ও চরিত্রবিকাশের জন্য অপর কতকগুলি পাত্র-পাত্রীর সমাবেশ করিতে হইয়াছে; যথা পেষমন, ভৃত্য, নবকুমার, মিহরুন্নিসা, সেলিম, খাঁ আজিম, শশ্রুজননী, কপালকুণ্ডলা, কাপালিক; (তাঁহার মাতাপিতা ও উড়িষ্যা-প্রবাসী ভ্রাতার উল্লেখমাত্র আছে)।

গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিভক্ত। **প্রথম** খণ্ডের প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদ আখ্যায়িকা-রূপ অট্টালিকার সোপান। নায়ককে প্রধান আখ্যানের নায়িকার সম্মুখীন করিবার জন্য গঙ্গাসাগর-যাত্রার প্রসঙ্গ এই দুইটি পরিচ্ছেদে কল্পিত।* এই প্রয়োজনে মাঝি, বৃদ্ধ প্রতিবেশী এবং অন্যান্য প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণের অবতারণা করিতে হইয়াছে। এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাহাদিগের তিরোভাব। (নায়কের অলীকমৃত্যু-

---

* দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ॥

রত্নাবলী।

সংবাদ-রটনাপ্রসঙ্গে আর একবার—২য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে—প্রতিবেশীদিগের অবতারণা আছে।) এই বৃত্তান্ত সঙ্গে সঙ্গে নায়কের চরিত্রের উপরও আলোকসম্পাত করে। তিনি সাহসী ও পরোপকারী।

প্রথম খণ্ডের অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলিতে নায়কের বিপদ্, উক্ত বিপদ্ঘটনে ও তন্নিবারণে কাপালিক, কপালকুণ্ডলা ও অধিকারীর কর্তৃত্ব এবং উদ্ধারকর্ত্রীর ভবিষ্যৎ বিপন্নিবারণের উদ্দেশ্যে অধিকারীর পরামর্শে নায়ক-নায়িকার বিবাহ ও স্থানত্যাগ। এই খণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্ব ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; আবার নায়কের পূর্ব্ব ইতিহাসের সহিত অপ্রধান আখ্যানের নায়িকার পূর্ব্ব ইতিহাস জড়িত (এই খণ্ডের ৮ম পরিচ্ছেদে)।

প্রধান আখ্যানের নায়িকার জীবনগতির পরিবর্ত্তন **প্রথম** খণ্ডের প্রকৃত বর্ণনীয় বস্তু। এই খণ্ডে নায়িকার সমগ্র কুমারীজীবন বিবৃত ও বিবাহিত জীবন আরব্ধ। প্রকৃতিদুহিতার পূর্ব্বপরিবেষ্টনী-পরিত্যাগে এই খণ্ডের শেষ। নায়ক-নায়িকা উভয়েরই চরিত্রের পরিচয় এই খণ্ডে প্রদত্ত। উভয়েই পরোপকারের জন্য উৎসৃষ্টপ্রাণ—অতএব উভয়ের উদ্বাহসূত্রে মিলনে 'যোগ্যং যোগ্যেন (যোগ্যয়া ?) যোজয়েৎ' এই বাক্য সার্থক হইয়াছে, ইহা প্রণিধানযোগ্য।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম তিনটী পরিচ্ছেদে অপ্রধান আখ্যানের নায়িকার আবির্ভাব এবং উভয় আখ্যানের নায়িকাদ্বয় ও সংযোগী পুরুষের সম্মিলনে আখ্যানদ্বয়ের প্রথম গ্রন্থিবন্ধন। বহুকাল পরে পতিসন্দর্শনে পদ্মাবতীর হৃদয়ক্ষেত্রে পতিপ্রেমের বীজ উপ্ত হইল। ইহার পরিণতি ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডে প্রদর্শিত হইবে। অবশিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি প্রধান আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। ৪র্থ পরিচ্ছেদে ভিক্ষুকের ব্যাপারে প্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রের আর একটু বিকাশ প্রদর্শিত। পরবর্ত্তী

পরিচ্ছেদগুলিতে প্রধান আখ্যানের নায়িকার পতিগৃহে স্থানলাভের বৃত্তান্ত বর্ণিত। এখনও পর্য্যন্ত প্রকৃতিদুহিতার প্রকৃতি অপরিবর্ত্তিত। প্রমাণ—এই খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে শ্যামার সহিত কথোপকথন।

সমস্ত তৃতীয় খণ্ড (শেষ পরিচ্ছেদ ব্যতীত) অপ্রধান আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে অপ্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন সবিস্তারে বর্ণিত। ২য় খণ্ডের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে বহুদিন পরে দৈবাৎ স্বামিসন্দর্শনে যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কতকগুলি প্রবল কারণের সমবায়ে সেই বীজের পরিণতি ঘটিল। ইহার ফলে, স্বামিসঙ্গলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় পদ্মাবতীর সপ্তগ্রামে আগমনে উভয় আখ্যানের দ্বিতীয় গ্রন্থিবন্ধন। এই ব্যাপারে প্রধান আখ্যানের নায়িকার ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তন হইবে, পাঠকের মনে এই আশঙ্কা জাগায়। এই খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে প্রধান আখ্যানের প্রতিনায়ক কাপালিকের আবির্ভাবে সেই আশঙ্কা দৃঢ়ীকৃত হয়। এই শেষ পরিচ্ছেদে ৪র্থ খণ্ডের সূচনা, তথা, প্রধান আখ্যানের নায়িকার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সূচনা।

চতুর্থ খণ্ডের ১ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণভাবে প্রধান আখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় খণ্ডে যেমন অপ্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রের বিকাশ অঙ্কিত, চতুর্থ খণ্ডের এই কয়টি পরিচ্ছেদে সেইরূপ প্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রের বিকাশ অঙ্কিত। এই খণ্ডের প্রথমে তাঁহার চরিত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু কাপালিকের পুনরাবির্ভাবে তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্ব্বস্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম পরিচ্ছেদে উভয় আখ্যান গ্রন্থিবদ্ধ। অপ্রধান আখ্যানের নায়িকার সঙ্ঘর্ষে আসিয়া প্রধান আখ্যানের নায়িকার স্বভাবের পূর্ব্বপ্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাইল। ৭ম পরিচ্ছেদে অপ্রধান আখ্যানের ও ৯ম পরিচ্ছেদে প্রধান আখ্যানের চরম পরিণতি। শেষ খণ্ডে,

উভয় আখ্যানের নায়িকার চরিত্রগত পার্থক্য—বিরোধিতা (contrast) সুপরিস্ফুট ; প্রধান আখ্যানের নায়িকার চরিত্রগত বিশিষ্টতার অপ্রতিবিধেয় পরিণামও প্রত্যক্ষীভূত।

নায়িকার দেহ-সৌন্দর্য্য।

প্রথম অধ্যায়ে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের অঙ্কিত সমশ্রেণীর কয়েকটি নায়িকার সহিত কপালকুণ্ডলার তুলনায় সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে কপালকুণ্ডলা-চরিত্রের সকল উপাদানের সম্যক্ বিচার এবং তৎপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয়-প্রদান ঘটে নাই। এক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে কপালকুণ্ডলার চরিত্র বিশ্লেষণ করিব।

প্রথমে তাঁহার বহিঃসৌন্দর্য্যের কথাই বলি।

কপালকুণ্ডলা অপূর্ব্বসুন্দরী। কাব্যের নায়িকারা সকলে অসামান্য সুন্দরী বলিয়াই বর্ণিত হয়েন। ইহাই চিরন্তন প্রথা। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রথার অন্যথা করেন নাই। কিন্তু কপালকুণ্ডলার দেহসৌন্দর্য্যে আর একটি তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকৃতি-দুহিতার উপযোগী, ইহা প্রকৃতির দান অথবা প্রকৃতিমাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

অবশ্য ধরিতে গেলে, সুরূপ ও কুরূপ, সৌন্দর্য্য ও কুৎসিতত্ব, উভয়ই প্রকৃতির দান। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথা আছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে নির্ম্মল আত্মা নিজ বাসের জন্য সুন্দর দেহপিঞ্জর প্রস্তুত করিয়া লয়; সুন্দর দেহ নির্ম্মল আত্মার আশ্রয় এবং কুৎসিত দেহ কুৎসিত আত্মার আশ্রয়। ইংরেজ কবি স্পেন্‌সার প্লেটোর এই তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। * এই তত্ত্বের মূর্ত্ত উদাহরণ, শেক্‌স্‌পীয়ারের

* *For Soul is Form, and doth the body make.*

মিরান্ডা ও ক্যালিব্যান। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যেও কপালকুণ্ডলা ও কাপালিকের আকৃতি-প্রকৃতি এই তত্ত্বেরই (application) প্রয়োগের নিদর্শন।

কপালকুণ্ডলার দেহ-সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন কবিদিগের প্রথায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লম্বা ফর্দ্দ দাখিল করেন নাই। কিন্তু তাঁহার দুচারিটি কথায়ই এই অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তির ছবিখানি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক্ষেত্রে তিনি নিপুণ চিত্রকরের সমকক্ষ।

"কেশভার,—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—

Therefore where-ever that thou doest behold
A comely corpse, with beauty fair endewed
Know this for certain, that the same doth hold
A beauteous soul, with fair conditions thewed
Fit to receive the seed of virtue strewed ;
For all that fair is, is by nature good.
—*Spenser's Hymn in Honour of Beauty.*

For all that is good is beautiful and fair.
—*Spenser's Hymn of Heavenly Beauty.*

'This woman, whose beauty it was hardly possible to think of as anything but the necessary consequence of her noble nature.'—*Romola*, Ch 12. 'Beauty is part of the finished language by which goodness speaks'. Ch 19.

আমাদের কবিগণও বলিয়াছেন :—ন হ্যাকৃতিঃ সুসদৃশং বিজহাতি বৃত্তম্। অপিচ, যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।

তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ কি চিকুর, উভয়েরই শ্রী বিকশিত হইতেছিল।" [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।]

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বহু স্থলে কপালকুণ্ডলার ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল বর্ণনা করিয়াছেন। নায়িকা যখন নবকুমারকে কাপালিকের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে উদ্যত, তখন তিনি 'আগুল্ফলম্বিত নিবিড় কেশরাশিধারিণী বনদেবীমূর্ত্তি।' [১ম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] মতিবিবি যখন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন, তখনও 'অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল।' [২য় খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ।] যখন আমরা তাঁহাকে ননন্দা শ্যামার সহিত সপ্তগ্রামে প্রাসাদোপরি দেখি, তখনও সেই 'চন্দ্ররশ্মি-বর্ণাভা অবিন্যস্ত কেশভার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধলুক্কায়িতা।' [৩য় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।] যখন যোগিনী গৃহিণী হইয়াছেন, তখন শ্যামার ভবিষ্যদ্বাণী 'বাঁধাব চুলের রাশ' সত্য হইয়াছে। 'সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল, ভুজঙ্গমের ব্যূহতুল্য, আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণীসম্বদ্ধ হইয়াছে। মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্দ্ধলুক্কায়িত নহে।' শেষের রাত্রিতে পুরুষবেশীর সাক্ষাৎকারের জন্য পুনর্যাত্রাকালে তিনি 'অনবকাশপ্রযুক্ত সে বিশাল কেশরাশি পুনর্বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই, অতএব আজি কপালকুণ্ডলা অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন।'

[৪র্থ খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।] আবার ৭ম পরিচ্ছেদে আমরা 'আলুলায়িত-কুন্তলা' কপালকুণ্ডলার দর্শন পাই।

কপালকুণ্ডলার আগুল্ফলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কেশদামের উল্লেখে আমাদের আবার কালিদাসের শকুন্তলা, মিল্টনের ঈভ ও বায়রনের হেইডীকে মনে পড়ে। চারি জনেরই চিকুরপ্রকর উপকথার কেশবতী রাজকন্যার মত। শকুন্তলার 'বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুলা মূর্দ্ধজাঃ' দুষ্যন্তকর্ত্তৃক (১ম অঙ্কে) বর্ণিত ও বিদূষক কর্ত্তৃক (ষষ্ঠ অঙ্কে) পুনরুল্লিখিত হইয়াছে *। অতএব নামটি দন্ত্যসকারাদি বাণান করিয়া তাঁহাকে কুন্তলপ্রশস্তিমতী বলিতেও পারা যায়।

ঈভের কেশবর্ণনা সুবিদিত। তিনিও কপালকুণ্ডলার ন্যায় প্রকৃতি-দুহিতা, সুতরাং 'অবেণীসম্বদ্ধকুন্তলা'(তবে তাঁহার কেশ অবশ্য বিলাতী রুচি অনুসারে স্বর্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণিত) পরন্তু নিষ্পাপ অবস্থায় নিরাভরণা বিবস্ত্রা অনাবৃতদেহা ঈভের চিকুরকলাপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া † পিউরিট্যান কবি আদিম মানবীর লজ্জারক্ষা করিয়াছেন।

She, as a veil down to the slender waist,
Her unadorned golden tresses wore,
Dishevelled but in wanton ringlets waved
As the vine curls her tendrils.

প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলা কিন্তু নিরাভরণা হইলেও শকুন্তলা ও মিরা্যা-

---

* মরীচির আশ্রমে (সপ্তম অঙ্কে) শকুন্তলা প্রোষিতভর্ত্তৃকা সুতরাং 'ধৃতৈক-বেণিঃ'।

† বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারামে' [১ম খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ] বৃক্ষারূঢ়া শ্রীকে যখন 'অসংখ্য জনতার সম্মুখবর্ত্তিনী' করিয়াছেন, তখন তাহাকে বৃক্ষের 'ঘনশাখাপল্লব' দিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। এখানেও কবির উদ্দেশ্য নারীর লজ্জানিবারণ।

ণ্ডার মত সমাজানুমোদিত পরিচ্ছদে আবৃতদেহা। তথাপি কবি বলিয়াছেন—'কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য, বাহুযুগের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল।'

হেইডীর কেশ বিলাতী রুচি অনুসারে ঈভের কেশের ন্যায় স্বর্ণবর্ণ, উহা কপালকুণ্ডলার কেশের ন্যায় চরণচুম্বী, কিন্তু বেণীবদ্ধ ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত।

Her clustering hair, whose longer locks were roll'd
In braids behind ; and though her stature were
Even of the highest for a female mould,
They nearly reach'd her heel.

[*Don Juan*, Canto II. Stanza 116]

Her hair's long auburn waves down to her heel
Flow'd like an Alpine torrent which the Sun
Dyes with his morning light,—and would conceal
Her person if allow'd at large to run.

[Canto III. Stanza *73*]

কপালকুণ্ডলার অবেণীসম্বদ্ধ কুন্তলকলাপ প্রকৃতিদুহিতার উপযোগী।

সুন্দরীকুলের কেশের আকর্ষণে (বৈজ্ঞানিকের কৈশিক আকর্ষণ নহে!) প্রস্তুতপ্রসঙ্গ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি? কবি বলিয়াছেন—

* এই সকল উদ্ধৃত বাক্যের ঘটা দেখিয়া কেহ যেন ভাবিয়া না বসেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসী সৃষ্টি কপালকুণ্ডলার চুল ধার-করা, অর্থাৎ পরচুলা-মাত্র!

Fair tresses man's imperial race ensnare
And Beauty draws us with a single hair.

[*Pope :—Rape of the Lock.*]

এক্ষণে কপালকুণ্ডলার বহিঃসৌন্দর্য্য ছাড়িয়া তাঁহার অন্তঃসৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ করিব, ইংরেজ কবি স্পেন্‌সারের ভাষায় 'the inward beauty of her lively spright' প্রদর্শন করিব। বৈষ্ণব কবির কথায়, 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'

নায়িকার চরিত্র-বিশ্লেষণ।

(/•) আদিম মানব-প্রকৃতির উপাদান।

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, আদিম-মানব-প্রকৃতিতে দুর্দ্দম কৌতূহল-পরায়ণতা, বিস্ময়, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাহস, বুদ্ধি প্রভৃতি স্বভাবজ বৃত্তি থাকে। কপালকুণ্ডলার চরিত্রে এ সকল বৃত্তি ত আছেই, তৎসঙ্গে অকৃত্রিম সরলতা থাকিয়া তাঁহাকে প্রকৃত প্রকৃতিদুহিতায় পরিণত করিয়াছে। প্রথমে, এই স্বভাবজ বৃত্তিগুলি তাঁহার চরিত্রে কি ভাবে বর্ত্তমান, তাহার আলোচনা করিয়া, পরে তাঁহার চরিত্রের অন্তর্নিহিত উৎকৃষ্টতর গুণাবলির পরিচয় দিব।

১ম খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা অপরিচিত যুবা পুরুষ নবকুমারকে দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় করিলেন না, স্বচ্ছন্দে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। লোকসমাজে মিশিলে যে লজ্জাশিক্ষা হয়, যে লজ্জাশীলতা শকুন্তলার প্রকৃতিকে রমণীয় করিয়াছিল, কপালকুণ্ডলার চরিত্রে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। অপরিচিত পুরুষের সহিত আমাদের সমাজে এরূপ বাক্যালাপ দোষাবহ—বিশেষতঃ যুবকযুবতীর

পক্ষে ; এমন কি প্রাচীন সমাজের চিত্রেও সেই দোষ পরিহার করিবার মানসে কালিদাসকে শকুন্তলার যুগলসখী কল্পনা করিতে হইয়াছে। মিরাণ্ডার ন্যায় কপালকুণ্ডলার এই ব্যবহার তাঁহার অসামান্য সরলতা ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার (unconventionalism) নিদর্শন। সরলতার জন্যই এই সঙ্কোচসাধ্বস-হীনতা ; ইহা প্রগল্‌ভতা, ব্যাপকতা বা বেহায়ামি নহে। নারীর ভূষণ যে লজ্জা, তাহার অভাবেও নায়িকাচরিত্রের মাধুর্য্য-সৌকুমার্য্য নষ্ট হয় নাই, ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের ও শেক্‌স্‌পীয়ারের লিপি-চাতুর্য্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই প্রথম-সাক্ষাতে নায়ক-নায়িকা 'বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া রহিলেন।' কিন্তু ইহা 'এ চাহে উহার পানে, চিতহারা দুইজনে, বাক্য নাহি সরে রে'—এবংবিধ অবস্থা নহে। ইহা চারিচক্ষুঃর চোরা চাহনিতে প্রথম প্রেমোন্মেষের সূচনা নহে। সুতরাং এ চাহনিতে (শকুন্তলার বা শ্রীরাধার ন্যায়) লজ্জাসঙ্কোচ নাই। ইহা বিস্ময়জনিত ; মিরাণ্ডার ন্যায় কপালকুণ্ডলাও বিরলমনুষ্য প্রদেশে এই নবীন আগন্তুককে বিস্ময়পূর্ণ ও প্রশংসমান চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, ইহাই কবির তাৎপর্য্য। কৌতূহল ও বিস্ময় এরূপ আদিম মানব-প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক।

আর একটি দৃশ্যে (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে) নবকুমার যখন কাপালিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীত হইতেছেন, তখন 'অকস্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল করস্পর্শ হইল।' অসঙ্কোচে পুরুষের গাত্রস্পর্শ, এই দ্বিধাশূন্যতাও 'ষোড়শী'র সরলতা ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয়।

'নবকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া আছে। নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাক্যস্ফূর্ত্তি নিষেধ করিতেছে।' আমরাও বুঝিলাম, রমণী শুধু সরলা নহেন, পরন্তু বুদ্ধিমতী। জীবনসংগ্রামের সঙ্ঘর্ষে না আসিয়াও তাঁহার ধীশক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। নবকুমার

সম্বন্ধে কাপালিকের নিষ্ঠুর উদ্দেশ্য বিষয়ে কপালকুণ্ডলার স্পষ্টজ্ঞানও তাঁহার বুদ্ধির পরিচায়ক। 'নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?' কাপালিকের খড়্গ স্থানান্তরিত করিয়া রাখাও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক। পরন্তু নবকুমারকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে তিনি যে যে উপায় অবলম্বন করিলেন, তৎসমস্তই তাঁহার সাহস ও বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। আবার অপরিচিত যুবককে অধিকারীর আশ্রয়ে আনয়ন যেমন একদিকে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তেমনি অন্যদিকে ইহাও সপ্রমাণ করে যে, 'পাছে লোকে কিছু বলে' তদ্‌বিষয়ে দ্বিধাবোধ তাঁহার প্রকৃতিতে নাই। অর্থাৎ তিনি সমাজনিয়মানভিজ্ঞা।

ইহার পরে অধিকারীর সহিত কপালকুণ্ডলার যে কথোপকথন হইল, [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ] তাহাতে বুঝা যায়, কপালকুণ্ডলা সমাজের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎজ্ঞান লাভ করিয়া অভিজ্ঞা না হইলেও, অধিকারীর মুখে শুনিয়া কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছেন। যুবতীর যুবা পুরুষের সঙ্গে অন্যত্র গমন দোষাবহ, ইহা তিনি অধিকারীর মুখে শুনিয়াছেন। কাপালিকের হস্তে কি অত্যাচারের আশঙ্কা, তাহাও অধিকারীর মুখে শুনিয়া 'কিছু বুঝিল না, তবে তাহার বড় ভয় হইল।' মিরান্ডা বোধ হয় ক্যালিব্যানের দুর্ব্যবহারে ইহা অপেক্ষা স্পষ্টজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অধিকারীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বুঝা যায়, কপালকুণ্ডলা বিবাহ কি পদার্থ বুঝিতেন না; মিরান্ডা ও শকুন্তলার তুলনায় তিনি সামাজিক অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। 'বি—বা—হ, এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, "বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?"……অধিকারী মনে করিলেন সকলই বুঝাইলেন, কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই

বুঝিলেন।' [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ]। * এ সকল বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে পিতৃকল্প অধিকারীর সহিত আলোচনা করাতেও তাঁহার অসামান্য সরলতা ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। মিরাণ্ডার চরিত্রেও অনুরূপ অবস্থায় এইরূপ সরলতা দেখা যায়। কেন না উভয়েই সমাজ হইতে দূরে বাস করিতেন, সমাজে বাস করিলে যে লজ্জাসঙ্কোচ-শিক্ষা হয়, তাহা তাঁহাদিগের হয় নাই। পক্ষান্তরে আশ্রমে বাস করিলেও শকুন্তলা একেবারে সমাজ-নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না, সুতরাং এরূপ স্থলে তাঁহার চরিত্রে লজ্জাজড়তা দেখা যায়।

স্বামীর সহিত পতিগৃহে যাইবার পথে [২য় খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ] 'পান্থনিবাসে' যখন মতিবিবি তাঁহাকে 'অনিমিষলোচনে দেখিতে লাগিলেন', তখন কপালকুণ্ডলা 'কিছু বিস্মিতা।' এই বিস্ময় প্রকৃতিদুহিতার পক্ষে স্বাভাবিক। 'মতিবিবি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কারাদি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না।' নবকুমার অলঙ্কার-গ্রহণ সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন, কপালকুণ্ডলা করিলেন না। এই তূষ্ণীম্ভাব স্ত্রীজাতির অলঙ্কারপ্রীতির পরিচয় নহে, ইহা তাঁহার অসামান্য সরলতা ও সামাজিক আচারজ্ঞানের অভাবের পরিচয়। স্নেহময় অধিকারী যখন তাঁহার কাপড়ে অর্থ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তখন তিনি যেমন দ্বিধাশূন্যা, অপরিচিতার নিকট দানগ্রহণ করিতেও তিনি সেইরূপ দ্বিধাশূন্যা। কেন না এরূপ দানগ্রহণে যে

---

* জর্জ-এলিয়টের এপিরও বিবাহ-সম্বন্ধে এইরূপ অস্পষ্ট জ্ঞান ছিল। 'Everybody's married, Aaron says'—এপির এই বাক্য তাহার সরলতা ও সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয়। এপিও নিঃসঙ্কোচে স্নেহময় পালক-পিতার সহিত এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়াছে। তবে সে প্রণয় কি পদার্থ তাহা বুঝিত এবং প্রণয়েও পড়িয়াছিল। কপালকুণ্ডলা 'ও রস বঞ্চিত'।

নিজেকে খাটো করা হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন না। স্বামীর সমক্ষে মতিবিবি যখন তাঁহার মুখ দেখিতেছিলেন, তখন তাঁহার কুলবধূচিত লজ্জা হইল না। ইহাও পূর্ব্বোক্ত কারণে।

(পরপরিচ্ছেদে) 'শিবিকারোহণে' যাইতে যাইতে যখন তিনি ভিক্ষুকের মুখে শুনিলেন গহনা পাইলে সে সন্তুষ্ট হয়, তখন তিনি 'অকপট-হৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন।' গহনা পাইয়াই ভিক্ষুক দৌড়িল কেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এখানেও তাঁহার অসামান্য সরলতার পরিচয়, ইহা নির্ব্বুদ্ধিতা বা অমিতব্যয়িতা নহে। (তিনি অলঙ্কাররাশির মূল্য জানিতেন না।)

লোকালয়ে বাস করিয়া তাঁহার কোন মানসিক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কিনা, জানিতে কৌতূহল হয়। ২য় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে ('অবরোধে') ও ৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে ('শয়নাগারে') স্নেহময়ী ননন্দা শ্যামার সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৎপাঠে সে কৌতূহল চরিতার্থ হয়। আমরা পাঠকবর্গকে পরিচ্ছেদ দুইটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রথমটিতে দেখি, যোগিনী যোগিনীই আছেন ; পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তিনি সেই সরলা সংসারানভিজ্ঞা বনবালা। এখনও পূর্ব্বের ন্যায় 'সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলেই তাঁহার সুখ জন্মে'। বুঝা গেল, লোকালয়ে বাস করিয়াও এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, শকুন্তলার ন্যায় প্রকৃতির সহিত একাত্মতা কপালকুণ্ডলার বেলায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই ; কিন্তু এই 'বনে বনে বেড়াইতে পারিলেই সুখ জন্মে,' বাক্যে বুঝা যায় তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির উপর বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব কত গভীরভাবে মুদ্রিত। আদিম-মানবপ্রকৃতির স্বাধীনতাপ্রিয়তাও এখনও অক্ষুন্ন আছে।

৪র্থ খণ্ডের প্রারম্ভে কিন্তু দেখা যায়, তাঁহার প্রকৃতিতে কিঞ্চিৎ

পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাহ্যদৃশ্যে এখন তিনি 'আলুলায়িতকুন্তলা ভূষণহীনা' কপালকুণ্ডলা নহেন, 'স্পর্শমণির সাহায্যে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে'; আবার শ্যামার সাহচর্য্যে ও সাহায্যে কেশবেশেরই যে কেবল পারিপাট্য হইয়াছে, তাহা নহে, কিঞ্চিৎ সংসারজ্ঞানও জন্মিয়াছে। তিনি শ্যামার দুঃখ বুঝেন, শ্যামার দুঃখে দুঃখবোধ করেন। 'তুমি কি মনে করিয়াছ যে আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?' এই প্রশ্নে বুঝা যায়, তিনি সমাজের নিয়ম (convention) জানিয়াছেন, অথচ তাহার উপর তাঁহার আস্থা নাই। পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তিনি 'পাছে লোকে কিছু বলে', এই ভয়ে ভীতা নহেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার কথা, 'মন্দলোকে মন্দ বলিলেই আমি তাতে মন্দ হইব না।' তিনি সমাজে থাকিয়া পদ্মপত্রের জলের মত টলটল করিতেছেন, একেবারে সামাজিক বিধিনিষেধে আত্মসমর্পণ করিতে পারেন নাই। তিনি লোকাচার লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া বনে একাকিনী ঔষধ তুলিতে যাইতে উদ্যত। এ সম্বন্ধে তিনি শ্যামার নিষেধ মানিলেন না, স্বামীর অসন্তোষের ভয়ও করিলেন না। 'যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না'—এই বাক্যে, তাঁহার স্বাধীন বন্যপ্রকৃতি এখনও অবিকৃত রহিয়াছে, বুঝা যায়। (পরিচ্ছেদের শীর্ষে 'রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ' ছত্রটিও তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তার ইঙ্গিত করে। ইহা প্রকৃতিদুহিতার চরিত্রের সহিত সুসঙ্গত।)

আবার স্বামীর প্রতি 'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কিনা, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও' এই গর্ব্বিত বচনে একদিকে যেমন তেজস্বিতা ও শুচিতা প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে তেমনি সামাজিক আচার-নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। হিজলীর জঙ্গলে স্ত্রীজাতির সতীত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অস্পষ্ট জ্ঞান ছিল, এক্ষণে সমাজের

সাক্ষাৎ সংস্পর্শে তাহা স্পষ্টতর হইয়াছে। অথচ তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিধিনিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিতে অকুণ্ঠিতা; ইহাতে বুঝা যায় তাঁহার পূর্ব্ব-প্রকৃতি প্রায় অপরিবর্ত্তিতই আছে। এখনও তিনি রাত্রিতে বনে বনে ভ্রমণ ভালবাসেন, তাহাতে কিছু দূষ্য আছে, স্বীকার করেন না। তিনি স্বামীর 'নিষেধ সত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন; অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে বনভ্রমণ করিতেন।' [৪র্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।] এ সকল স্থলে প্রকৃতিদুহিতার স্বাধীনতাপ্রিয়তা, এক-গুঁয়েমি প্রভৃতি বৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাঁহার স্বাভাবিক শুচিতা অব্যাহত।

গ্রন্থের সমগ্র চতুর্থ খণ্ডটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কেন না এই অংশ হইতে বুঝা যায়, বহুদিন মনুষ্যসমাজে বাস করিয়া তাঁহার প্রকৃতি কি পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং কি পরিমাণে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। হয়ত কাপালিকের পুনরাবির্ভাবে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ঘটনাচক্রে অকালে জীবনাবসান না হইলে পরিবর্ত্তন আরও অধিকদূর প্রসারিত হইত।

এই খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা 'নিবিড় বনমধ্যে আলো' দেখিলেন; তিনি 'পূর্ব্বাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে ভয়হীনা, অথচ কৌতূহলময়ী।' আলো দেখিয়া তিনি 'ভীতা হইবেন কি প্রফুল্লিতা হইবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।' আবার ৪র্থ পরিচ্ছেদে তিনি যখন পুরুষবেশীর সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ স্থির করিলেন, তখন তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'তিনি কৌতূহলপরবশা রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্তরূপরাশি-দর্শনলোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।' এই কৌতূহল সকল রমণীতে, এমন কি সকল মানবে,

বর্ত্তমান থাকিলেও, আদিম-মানবপ্রকৃতিতে অধিক পরিমাণে থাকে। পুরুষবেশীর 'কটাক্ষ দেখিয়া কপালকুণ্ডলার ভীতিসঞ্চার হইল। কপালকুণ্ডলা নয়ন-পল্লব নিক্ষিপ্ত করিলেন' ও সত্বর উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না। এ সকলের কারণ গ্রন্থকার নিজেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—'এখন কপালকুণ্ডলা কতকদূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন।' পূর্ব্বের সে সাহস ও সঙ্কোচহীনতা এক্ষণে অব্যাহত নাই। 'অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কিছু ভীতাও হইলেন। সুতরাং সহসা কোন উত্তর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।' এ স্থলেও তাঁহার প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন প্রতীয়মান। যাহা হউক, এই বাক্‌শক্তিলোপ অল্পক্ষণের জন্য ; 'সহসা কপালকুণ্ডলা বাক্‌শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন।'

পুরুষবেশী তাঁহার হস্তধারণ করিলে, 'কপালকুণ্ডলা অতিক্রোধে হস্তমুক্ত করিয়া লইলেন।' এখন সমাজে থাকিয়া তিনি পরপুরুষের এরূপ আচরণ দূষ্য, তাহা বুঝিয়াছেন। এই ব্যাপারে তাঁহার 'উদ্বেগ' ও 'ভয়' সঞ্চারিত হওয়াও তাঁহার লোকালয়ে বাসের ফল, তিনি এখন সমাজে থাকিয়া মানবকৃত অত্যাচার পাপাচার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

অথচ চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জ্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয়, ইহা ভাবিয়া তাঁহার সঙ্কোচ জন্মে নাই ; তদ্‌বিষয়ে তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দূষ্য না হইলে এমত সাক্ষাতে দোষ নাই। পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল।' অর্থাৎ তিনি সমাজের বিধিনিষেধ জানিতেন, কিন্তু মানিতেন না। অপরদিকে, পুরুষবেশীর সহিত 'সাক্ষাতে মঙ্গল কি অমঙ্গল জন্মিবে' তৎসম্বন্ধে বিতর্ক তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

সপ্তম পরিচ্ছেদে লুৎফউন্নিসা যখন নিজ পুরুষবেশধারণের কারণ নির্দ্দেশ করিলেন :—'তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে', তখন কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। লুৎফউন্নিসা পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিলে কি প্রকারে এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা তাঁহার সরল ও নির্ম্মল প্রকৃতিতে বোধগম্য হইল না। তিনি সপত্নীর কি উপকার করিতে পারেন, তাহা যতক্ষণ সপত্নী খোলসা করিয়া না বলিলেন, ততক্ষণ বুঝিতে পারিলেন না। তাহার পর সপত্নী যখন স্বামিত্যাগের পরিবর্ত্তে অট্টালিকা দাস দাসী দিতে চাহিলেন, তিনি তাহার মর্ম্ম বুঝিলেন না। সপত্নী বিদায়কালে তাঁহাকে পূর্ব্বপ্রদত্ত অলঙ্কাররাশির ন্যায় 'বহুধনে ক্রীত অঙ্গুরীয়' উপহার দিলেন, তখনও তিনি (সপত্নীর দান জানিয়াও) পূর্ব্বের ন্যায় তাহা অবিচলিতচিত্তে গ্রহণ করিলেন। এসমস্তই তাঁহার অকৃত্রিম সরলতার নিদর্শন।

শেষ দৃশ্যে যখন নবকুমার জানিতে চাহিলেন—'একবার বল যে তুমি অবিশ্বাসিনী নও,' তখন অবশ্য তিনি নবকুমারের অসহ্য যন্ত্রণার কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, লুৎফউন্নিসার কথাগুলি অবশ্যই তাঁহার মনে পড়িয়াছিল :—'আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া দিতাম।' [৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।] তদুত্তরে তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, 'তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই' এবং ক্ষণপরে অল্পকথায় পদ্মাবতীঘটিত ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—'আমি অবিশ্বাসিনী নহি।' এ অবস্থায় সাধারণ নারীর মত তাঁহার ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান, অপমানজ্ঞান, আহত আত্মসম্মান প্রভৃতি কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

(৷৵০) করুণা।

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, আদিম-মানবপ্রকৃতির মূল উপাদান কৌতূহল-পরায়ণতা প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা রমণীর রমণীয়ত্ব সম্পাদিত হয় না।

রমণীয় রমণীতে আমরা দেহের সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের কোমলতা ইত্যাদি আশা করি। কপালকুণ্ডলার দেহের সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াছি, তাঁহার সরলতার কথাও বলিলাম। কিন্তু এই অকৃত্রিম সরলতাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ নহে। তাঁহার প্রকৃতিগত করুণা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গৌরব। * জনবিরল প্রদেশেই হউক আর লোকালয়েই হউক, যখনই তাঁহার করুণা-প্রকাশের অবসর আসিয়াছে, তখনই তিনি স্বতঃ উৎসারিত করুণা-প্রবাহে পাঠকহৃদয় ভাসাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে এই গুণাতিশয্যের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দিব।

আমরা যখন কপালকুণ্ডলার প্রথম সাক্ষাৎ পাই, তখন তিনি অপরিচিত পুরুষ নবকুমারকে দেখিয়া 'স্পন্দহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন।···নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল। এইরূপে বহুক্ষণ দুইজনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"···রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস।" এই বলিয়া তরুণী চলিল; 'পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে অলক্ষ্যপাদবিক্ষেপে চলিল।' [১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।]

পূর্ব্বে বলিয়াছি কৌতূহল ও বিস্ময় আদিম-মানবপ্রকৃতিতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, কপালকুণ্ডলার করুণা, কৌতূহল ও বিস্ময়কে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টিতে 'বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল', ইহাই তাহার প্রমাণ। এই দৃশ্যে তাঁহার বাক্যে ও

* রুসোর মতে দয়া আদিম-মানব-প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম, ইহা নারীজাতির বিশিষ্টতা নহে।

কার্য্যে সরলতার সঙ্গে সঙ্গে নারীহৃদয়ের কোমলতা, পরদুঃখকাতরতা, করুণা ও তজ্জনিত পরোপচিকীর্ষা-প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দিগ্‌ভ্রান্ত পথহারা পথিককে পথ দেখাইয়া দিতে ব্যগ্র। অথচ ইহা কেবল করুণার প্রবর্ত্তনায়, অন্যান্য কাব্যে যেমন সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে তাহার কোন লক্ষণ নাই।

অদূর-ভবিষ্যতে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভয়ানক বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন, উল্লিখিত ঘটনা তাহার (prelude) সূচনামাত্র।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে নবকুমার যখন কাপালিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বধার্থ নীত হইতেছেন, তখন তাঁহার উদ্ধারার্থ কপালকুণ্ডলা পশ্চাৎ হইতে তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিয়া ও মুখে অঙ্গুলি দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি নিষেধ করিয়া, মৃদুস্বরে বলিল "কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।" ইহাতেও ফল হইল না দেখিয়া সে 'তীরের তুল্য বেগে' * তাঁহার পার্শ্ব দিয়া গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, "এখনও পলাও। নর-মাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না?"

অসঙ্কোচে পুরুষের গাত্রস্পর্শ কেবল যে তাঁহার সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার

---

* 'পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না' 'বসন্তকালে সঞ্চালিত মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে' 'তীরের তুল্য বেগে গমন' ইত্যাদি বাক্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ-বর্ণিত প্রকৃতি-দুহিতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

She shall be sportive as the fawn
That wild with glee across the lawn
Or up the mountain springs.
The floating clouds their state shall lend
To her ; &c.

ফল, তাহা নহে, এই কার্য্য তাঁহার সর্ব্বাতিশায়িনী করুণারও প্রমাণ। বিপন্নের বিপদুদ্ধারের জন্য তাঁহার পুনঃপুনঃ চেষ্টা ও সুদৃঢ় অধ্যবসায় দেখিলে বুঝা যায়, তাঁহার করুণাবৃত্তি কত প্রবল।

নবকুমার অভিভূত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়; কপালকুণ্ডলা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিলেও নবকুমার আত্মরক্ষার উপায় করিতে পারিলেন না। তাহার পর, কাপালিক যখন বলিদানে উদ্যত, তখন 'যথায় খড়্গ রাখিয়াছিল, তথায় খড়্গ পাইল না।' ইহাও বিপদ্‌বারিণী মায়ের বিপদ্‌বারিণী মেয়ের উপযুক্ত কার্য্য। তাহার পর কপালকুণ্ডলা কাপালিকের অনুপস্থিতির সুযোগে নবকুমারের সম্মুখে খড়্গহস্তা কিন্তু অভয়ামূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন, খড়্গদ্বারা তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং অধিকারীর নিকট লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিপন্নের প্রাণরক্ষা করিতে প্রার্থনা করিলেন। [ষষ্ঠ ও ৮ম পরিচ্ছেদ।] তিনি কাপালিকের একান্ত বাধ্য হইলেও এক্ষেত্রে অবাধ্যতা দেখাইলেন, খড়্গ চুরি ও প্রবঞ্চনা করিতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না, কাপালিকের ক্রোধে নিজের যে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করিয়া, পরের প্রাণরক্ষা করিলেন। গ্রন্থকার পরে বলিয়াছেন, 'কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখ-দুঃখিত হৃদয়ে সহিত না।' [৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।] এক্ষেত্রে তাঁহার করুণা তাঁহার প্রগাঢ় ভবানীভক্তিকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। অথচ মিরাণ্ডা, বা গ্রীক পুরাণে বর্ণিত মিডিয়া বা এরিয়াডনির ন্যায় তিনি প্রবল প্রেমের প্রভাবে নায়কের প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টিত হয়েন নাই। এই পরোপচিকীর্ষা অবিমিশ্র করুণা-প্রসূত। এই মোহিনী মূর্ত্তিতে যেন কবি বিহারীলালের 'করুণা-সুন্দরী' ও 'সুরবালা'মূর্ত্তি একাধারে বিরাজিত।

'যেন দেববালা কৃপায় নামিয়ে অবনীতলে।'

'কিবা অমায়িক বদনমণ্ডল,
কিবা অমায়িক বাসনা সকল,
কিবা অমায়িক নয়নগতি,
কিবা অমায়িক সরল মতি।'

আবার ৮ম পরিচ্ছেদে অধিকারীর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে জানা যায়, কাপালিকের নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইয়াও কপালকুণ্ডলা কাপালিককে ত্যাগ করিয়া যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন, 'তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।' এই মমতা ও কৃতজ্ঞতা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার প্রকৃতি কত কোমল। নিষ্ঠুর কাপালিককেও ছাড়িয়া যাইতে যাঁহার মন সরে না, তাঁহার স্নেহময় অধিকারীকে ছাড়িয়া যাইতে যে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। 'তখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাঁহার একমাত্র সুহৃদ্ সে বিদায় হইতেছে।' [১ম খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ।] এই বিদায়দৃশ্য শকুন্তলার বিদায়দৃশ্যের ন্যায় সবিস্তারে বর্ণিত না হইলেও ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, কপালকুণ্ডলার হৃদয় কত কোমল, তাঁহার মায়া-মমতা কত গভীর।

প্রথম খণ্ডে কপালকুণ্ডলার কুমারীজীবন শেষ হইয়া বিবাহিত-জীবনের কেবল সূচনা হইয়াছে। জীবনের এই ভাগে তাঁহার করুণা কত গভীর, তাহা দেখিলাম। স্বামীর সহিত পতিগৃহ-গমনকালে তিনি ভিক্ষুককে তাহার প্রার্থনামত অলঙ্কাররাশি প্রদান করিলেন। [২য় খণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ]। যদিও সরলা বনবালা অলঙ্কারের মূল্য জানিতেন না, তথাপি গহনা পাইলে ভিক্ষুক সন্তুষ্ট হয়, তাহার এ কথা শুনিয়া তিনি যে 'অকপট-

হৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন', ইহাতে তাঁহার দয়া ও উদারতা প্রকাশ পাইতেছে। লোকালয়ে বাসকালে তাঁহার মনের অন্য পরিবর্ত্তন হইলেও দয়াবৃত্তি অবিকৃত থাকিবে, এই সামান্য ঘটনা তাহারই (prelude) সূচনামাত্র।

এই অবিকৃত দয়াবৃত্তির প্রমাণ 'এক বৎসরের অধিক কাল' লোকালয়ে বাসের পর ৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত ননদভাজের কথোপকথন হইতে তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় করুণা, সমবেদনা ও পরোপচিকীর্ষাপ্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় যাওয়া যায়। তিনি স্নেহময়ী ননন্দাকে স্বামি-সৌভাগ্যবতী করিবার উদ্দেশ্যে লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া একাকিনী রাত্রিকালে বনে ঔষধ আহরণ করিতে যাইতে কৃতনিশ্চয়। এ সম্বন্ধে তিনি শ্যামার নিষেধ মানিলেন না, স্বামীর অসন্তোষের ভয়ও করিলেন না। স্বামী বাধা দিতে আসিলে তাঁহার মনঃ-কষ্টের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন, 'তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।' ধরিতে গেলে, এই করুণা-প্রণোদিত কার্য্যেই তাঁহার ভবিষ্যৎ বিষম পরিণামের উৎপত্তি।

তাঁহার এই অবিকৃত দয়াবৃত্তির আর একটি পরিচয় তাঁহার সপত্নী পদ্মাবতীর প্রতি ব্যবহার। সপত্নী তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া অবশেষে যখন স্বামী ত্যাগ করিতে বলিলেন, তখন তিনি কিয়ৎকাল চিন্তার পর অম্লানবদনে বলিলেন, 'আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।' [৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।] ইহাতে যেমন তাঁহার সরলতা প্রকাশিত, তেমনি অপরদিকে তাঁহার করুণা, সমবেদনা, পরোপচিকীর্ষা-প্রবৃত্তি পরিস্ফুট। শ্যামার দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার যেরূপ আগ্রহ, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ

আগ্রহ, তবে অপরিচিতার জন্য আগ্রহ অবশ্য ততটা তীব্র নহে। ননন্দা শ্যামার দুঃখ দূর করিবার প্রয়াস ভবিষ্যতে সপত্নীর দুঃখ দূর করিবার প্রয়াসের (prelude) সূচনা। (তিনি কেন এই প্রস্তাব-শ্রবণে 'অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না' তাহা পরে বুঝাইব।)

৪র্থ খণ্ডের ৯ম পরিচ্ছেদে অঙ্কিত শেষদৃশ্যে যখন কপালকুণ্ডলা স্বামীর অবস্থাদর্শনে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন "ভয় পাইতেছ?" "তবে কাঁপিতেছ কেন?" "কাঁদিবে কেন?" তখনও তাঁহার নারীহৃদয় করুণায়, সমবেদনায় কাতর। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, 'যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে।' আসন্নমরণা করুণাময়ী তখনও অন্যের দুঃখে কাতর, অন্যের দুঃখ দূর করিতে ব্যগ্র। আবার সেই ব্যগ্রতাবশতঃই, অর্থাৎ নবকুমারের মুখে তাঁহার অসহ্য যাতনার কারণ অবগত হইয়া সেই যন্ত্রণা দূর করিবার জন্যই, তিনি স্বামীকে লুৎফউন্নিসা-ঘটিত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন—নিজ নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার কুলবধূচিত আবেগবশে নহে। শেষ দৃশ্যেও সেই করুণার প্রস্রবণ উৎসারিত।

কপালকুণ্ডলার প্রথম-দর্শনেই আমরা তাঁহার করুণার পরিচয় পাই; নবকুমার সেই করুণার পাত্র, ইহাও দেখিতে পাই। শেষদর্শনেও তাঁহার শেষ কথা, তাঁহার হৃদয়ের শেষ স্পন্দন, নবকুমারের প্রতি করুণায় অনুপ্রাণিত। এই অপূর্ব্ব নারীচরিত্রে বরাবর যেন এক করুণাধারা প্রবাহিত।

(৮/০) প্রণয়, পত্নীভাব ও মাতৃভাবের অভাব।

আমরা দেখিলাম, কপালকুণ্ডলার হৃদয়-সমুদ্র করুণাসুধায় কাণায় কাণায় পূর্ণ, ইহা তাঁহার চরিত্রের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যবিধান করিয়াছে। কিন্তু ইহাকে তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা বলা যায় না। কেন না 'কপালকুণ্ডলা'

আখ্যায়িকার পূর্ব্ববর্ত্তী 'দুর্গেশনন্দিনী' ও পরবর্ত্তী 'মৃণালিনী'তে অঙ্কিত আয়েষা ও মনোরমার চরিত্রেও করুণার সমাবেশ দেখা যায়। কপাল-কুণ্ডলা-চরিত্রের বিশিষ্টতা দুইটি বিষয়ে—(১) তাঁহার গভীর ধর্ম্মভাবে এবং (২) নায়িকার পূর্ব্বরাগ, পত্নীর অনুরাগ, মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য, এই নারীজনোচিত বৃত্তিত্রয়ের অভাবে। (কোন কোন দার্শনিকের মতে যখন অভাবও একটা পদার্থ, তখন অভাব-পদার্থ দ্বারাও বিশিষ্টতা জন্মিবার বাধা নাই।) ধর্ম্মভাবের কথা পর-পরিচ্ছেদে বলিব। এক্ষণে শুধু এইটুকু বুঝাইব যে, প্রণয়, দাম্পত্যপ্রেম, পতিপ্রীতি, পতিভক্তি তাঁহার চরিত্রে আদৌ নাই। আবার দাম্পত্য-প্রীতির অভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকৃতিতে মাতৃভাবের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। 'সোণার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে, দেখি ভাল লাগে কি না লাগে', শ্যামার মুখের এই মধুর মাতৃভাবে মস্‌গুল ছড়া তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতিতে কোন সাড়া পায় না, তাঁহার হৃদয়ে appeal করে না। এই কারণেই কবি তাঁহাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন। সন্তানজননী হইলে তাঁহার 'বন্য-প্রকৃতি' আমূল পরিবর্ত্তিত হইত। পতিপ্রীতি পূর্ব্বে না জন্মিলেও নৈসর্গিক অপত্যস্নেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে উহার বিকাশ হইত। 'The child too clothes the father with a dearness not his due'. * যাহা হউক, যাহা হইলে হইতে পারিত, তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, সমান অবস্থায় পতিত অন্যান্য নায়িকার ন্যায় কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে বিপন্ন অপরিচিত যুবক নবকুমারকে দেখিবামাত্র প্রেমসঞ্চার হয় নাই। অন্য নায়িকার ন্যায় তাঁহার প্রকৃতিতে 'একই

* *Tennyson :—Locksley Hall.* 'মা' প্রবন্ধে কপালকুণ্ডলা ও শৈবলিনী সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২২, ২৬৯ পৃঃ ও ২৭৬—৭৭ পৃঃ।

সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা' নহে। তিনি কেবল করুণার প্রবর্ত্তনায় নিজের বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া নবকুমারের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন।

কাপালিকের কবল হইতে কপালকুণ্ডলার মুক্তিলাভের অন্য উপায় না থাকাতে, অধিকারী যখন তাঁহাকে নবকুমারের পরিণীতা হইয়া পতির সহিত দূরদেশে প্রস্থান করিতে পরামর্শ দিলেন, তখন কপালকুণ্ডলার বাক্যে বুঝা যায় যে, তিনি 'বিবাহ' কি বস্তু, তাহা জানেন না। ইহা অবশ্য তাঁহার সমাজনিয়মানভিজ্ঞতার পরিচয়। [১ম খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।] প্রণয়ের উন্মেষ হইলে অন্ততঃ হৃদয়-মিলন হিসাবে বিষয়টি বুঝিবার পক্ষে তাঁহার একটুকু সুবিধা হইত, কিন্তু তাহার অভাবে তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহার পর অধিকারীর মুখে শিবদুর্গার বিবাহের কথা, 'বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান' এই তত্ত্ব শুনিয়া, ধর্ম্মভাব-পরিচালিত হইয়া স্নেহময় অধিকারীর আদেশ ও উপদেশে, এবং কাপালিকের ভবিষ্যৎ অত্যাচারের ভয়ে, তিনি বলিলেন "তবে বিবাহই হউক।" অতএব এ সম্মতিতে পূর্ব্বরাগ বা প্রণয়ের কোন লক্ষণ নাই। বিবাহকালেও অভীষ্ট বরে কন্যার প্রীতির কোন পরিচয় এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এইটুকু বুঝাইবার জন্যই কবি লিখিয়াছেন, 'কাপালিক-পালিতা **সন্ন্যাসিনীর** বিবাহ হইল।' অধিকারীর শেষ উপদেশ 'এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম' কপালকুণ্ডলা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, তাহা পরে তাঁহার ব্যবহারে বুঝা যাইবে।

২য় খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—'নবকুমার অজ্ঞাত-কুলশীলা **তপস্বিনীকে** বিবাহ করিয়া গৃহে আনায়'; ইহাতেও বুঝা যায়, এখনও কপালকুণ্ডলা তপস্বিনী, পতিভক্তিমতী বধূ নহেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ননন্দা শ্যামাসুন্দরীর সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তায় ইহা আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। তিনি শ্যামার আদিরসাশ্রিত ছড়ার রসগ্রহণ করিতে

পারেন না, 'পরশপাতর' চিনেন না। তিনি এখনও সেই 'তপস্বিনী'। 'তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকিবি ?' 'যোগিনী' এখনও 'গৃহিণী' হন নাই। 'চুল বাঁধিলাম; ভাল কাপড় পরিলাম: খোঁপায় ফুল দিলাম; কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম; কাণে দুল দুলিল; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোণার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ ?' এই কথায় বুঝা গেল, প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা, স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেষঃ,—তাহা তিনি বুঝেন না; পতির মনোরঞ্জন, পতির সঙ্গসুখ, অপত্যস্নেহ, নারীজীবনের সারসুখ, এ সকলের তিনি কিছুই জানেন না, কিছুই বুঝেন না।

এই কথোপকথনে একটি কৌতুকাবহ রহস্য প্রকাশিত। স্বামীর কথা বলিতে কপালকুণ্ডলা সীতা-শকুন্তলার মত 'আর্য্যপুত্র' * বা 'অজ্জউত্ত' বলেন নাই, কাব্যরসিকাদিগের মত 'প্রাণনাথ' 'প্রাণেশ্বর' 'প্রাণকান্ত' 'হৃদয়েশ্বর' বলেন নাই, ইন্দিরার সখীর ন্যায় 'বাবু' বা 'বাবুরাম' বলেন নাই, † 'জামাইবারিকের' দৃষ্টান্তানুসারে 'আমার নবকুমার' বলেন নাই, সাধারণ পল্লী-রমণীর মত সর্ব্বভুক্ সর্ব্বনাম 'তিনি' 'উনি'ও ব্যবহার করেন নাই, এমন কি পারিভাষিক 'পতি' 'ভর্ত্তা' 'স্বামী', 'বর' প্রভৃতি শব্দও উচ্চারণ করেন নাই; তিনি বলিতেছেন 'যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই', 'অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইল।' স্বামী তাঁহার নিকট কেবল 'ব্রাহ্মণসন্তান' ও 'অপরিচিত ব্যক্তি!' ইহার পর দু' একবার তিনি 'স্বামী' শব্দ মুখে আনিয়াছেন,

---

* এই সম্বোধন বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়ে' ব্যবহৃত হইয়াছে (৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদ।)

† ইন্দিরা ১ম খণ্ড ১২শ পরিচ্ছেদ।

তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, তিনি সমাজের আচার-সংস্কার মুখে মুখে শিখিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে হৃদ্‌গত করিতে পারেন নাই। স্বামীর সহিতও তাঁহার হৃদয়ের যোগ, একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

আবার ৪র্থ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে আমরা তাঁহার দেখা পাই। তখন 'যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে।' কিন্তু তখনও তিনি স্বামীর 'নিষেধ-সত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন, ইত্যাদি।' [৪র্থ খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ।] স্বামী গুরু, স্বামীর বাক্য গুরুবাক্য, তাহা অবহেলা করা পত্নীর অকর্ত্তব্য, ইহা তিনি বুঝিতেন না। নবকুমার রাত্রিভ্রমণে বাধা দিলে তিনি অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন, 'তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।' এই অপ্রসন্নতা ও অবাধ্যতা পরোপকারপ্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইলেও তাঁহার পতিভক্তির অভাবেরও পরিচায়ক। স্বামী অসুখী হইবেন শুনিয়া তিনি শ্যামাকে বলিতেছেন, 'ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।' তিনি একদিকে সমাজ-নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিতেন না, অপর দিকে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য, পতির সহিত একাত্মতা, 'স্ত্রীপুংসয়োরাত্মশক্ত্যোরেকত্বসম্পাদনং বিবাহঃ,' প্রণয়প্রভাবে 'যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম' প্রণিধান করিয়া উঠিতে পারিতেন না। ইহা বুদ্ধিহীনা বা হৃদয়হীনার আচরণ নহে, তাঁহার হৃদয়বৃত্তির এই প্রকারের অনুশীলন (Culture) হয় নাই। তিনি শৈশব হইতে যৌবন পর্য্যন্ত, জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত, 'ও রস বঞ্চিত।' নবকুমারের বিপৎকালে তাঁহার প্রতি করুণা, ক্রূরকর্ম্মা কাপালিকের অত্যাচারশঙ্কা হইতে মুক্ত করিয়া দূরদেশে আনার জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা, এবং একত্র সাহচর্য্যবশতঃ তাঁহার উপর একটা মায়া—কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে জন্মিয়াছিল;

কিন্তু ইহা তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতার অভিব্যক্তি, প্রণয় বা পতিপ্রেম নহে। *

কাপালিকের পুনর্দর্শনে যখন তাঁহার পূর্ব্বপ্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে ফিরিয়া আসিল, তখন তাঁহার চরিত্রের এই অংশ—পতিপ্রেমের অভাব—সুস্পষ্ট-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। [৪র্থ খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।] সপত্নী পদ্মাবতী তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া স্বামিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল, তখন 'কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না।' ইহা কুন্দর নীরবতার সহিত একজাতীয় নহে, ইহা প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত পরোপচিকীর্ষার সংগ্রাম—চিত্তবৃত্তির সংঘর্ষ—Conflict of feelings নহে। সংসার-জ্ঞানহীনা কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন, একেবারে নিরাশ্রয়া হইবেন, এই চিন্তায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। তিনি মুখেও সেই কথা 'অনেকক্ষণের পর কহিলেন'—"স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব ?" ইহার সহিত যে পতিপ্রেমের সম্পর্ক নাই, তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা যায়। 'কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না। তবে কেন লুৎফউন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন ?' গ্রন্থকার আবার পর-পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, 'এ সংসারবন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপাল-

---

* 'আনন্দমঠে' শান্তির ইতিহাসে [২য় খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ] আমরা দেখি 'স্বামিসহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল। রমণীয় রমণীচরিত্রের নিত্য নবোন্মেষ হইতে লাগিল।' কিন্তু কপালকুণ্ডলার বেলায় আমরা চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন দেখি না। কেন না পরিবর্ত্তনের মূলে যে পতিপ্রীতি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার চরিত্রে ছিল না।

কুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না।' এই জন্যই তিনি অনায়াসে লুৎফউন্নিসার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারিলেন।

তাহার পর, 'প্রেতভূমে' শেষদৃশ্যে যখন পতিপত্নী পরস্পরের সম্মুখীন, তখনও কপালকুণ্ডলার বাক্যে, কার্য্যে ও ব্যবহারে নবকুমারের প্রতি করুণার পরিচয় পাওয়া যায়, প্রণয়ের নহে। তিনি যখন মৃদুস্বরে কহিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই", সে স্বর পরদুঃখকাতরা করুণাময়ী নারীর স্বর, স্বামীর অবিশ্বাসে ভগ্নহৃদয়া ধিক্‌কৃতজীবিতা ডেস্‌ডেমোনার মর্ম্মভেদী স্বর নহে। 'আমি মরিব'—তাঁহার এই সঙ্কল্প মর্ম্মাহতা সতী নারীর উক্তি নহে, ভবানীচরণে সমর্পিতপ্রাণা সন্ন্যাসিনীর উক্তি। 'আমি অবিশ্বাসিনী নহি'—এই রহস্যোদ্ভেদ আত্মসম্মানরক্ষার ব্যগ্রতাজনিত নহে, নবকুমারের হৃন্মর্ম্মবেদনা-দূরীকরণের উদ্দেশ্যে করুণাপ্রসূত। ইহা সীতা-শকুন্তলার অথবা শেক্‌স্‌পীয়ার-বর্ণিত রাজ্ঞী ক্যাথারিন ও হার্ম্মিওনির সতীত্বগর্ব্ব নহে, ইহা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক শুচিতার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কপালকুণ্ডলা সীতা-শকুন্তলা, ডেস্‌ডেমোনা-আইমোজেন্, হার্ম্মিওনি-ক্যাথারিন্, তিলোত্তমা-মৃণালিনী বা রমার সজাতীয়া নহেন, বরং ইজাবেলার সগোত্রা।

স্থূল কথা, কপালকুণ্ডলা স্বর্গ, শ্যামা মর্ত্ত, পদ্মাবতী নরক। পদ্মাবতীর অবৈধ ইন্দ্রিয়সুখে বিতৃষ্ণা জন্মিলে, পতিপ্রেমের প্রভাবে প্রকৃতি পরিশোধিত হইলে, তিনি বিমল সংসারসুখলাভের জন্য লালায়িতা হইলেন; শ্যামাও এই বিমল সংসারসুখভোগের, স্বামিসৌভাগ্যলাভের জন্য আগ্রহশীলা; উভয়ের মধ্যে সন্ন্যাসিপালিতা প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলা সংসারসুখে অনাসক্তা, নির্লিপ্তভাবে অবস্থিতা, * অথচ উভয়ের প্রতিই মমতাময়ী ও উভয়ের সংসারসুখভোগের সহায়তা করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞা।

* এই বিরোধিতা-প্রদর্শন ছাড়া আর কি উদ্দেশ্যে শ্যামার অবতারণা, তাহা